দেবতার পাহাড়

নকুল মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৬৫

ভূমিকা

মস্তবড় দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। শত শত বছরের এর ইতিহাস। কত রাজা, কত বাদশা এল এই দেশে। এসে এর বুকে রাজত্ব করে গেল। লুটে নিয়ে গেল নানা ঐশ্বর্য, নানা সম্পদ। রেখে গেল নানা মত, নানা ধর্ম, নানা বিশ্বাস। বিদেশী বণিক্‌রাও এল একদিন। এসে তারাও রাজত্ব করে গেল।

আজ সবাই চলে গেছে। দেশ আমাদের আজ স্বাধীন। সব মত, সব বিশ্বাস আজ এক হয়ে গেছে। সে বিশ্বাস হল, "এ দেশ আমাদের। এর ভালমন্দ যা-কিছু সব আমাদের। সবাই মিলে এ দেশটাকে গড়ে তুলতে হবে নিজেদের মনের মত করে।"

আমার এই 'দেবতার পাহাড়' দেশটাকে এমনি করে গড়ে তোলারই ছোট্ট একটা কাহিনী। এ কাহিনী পড়ে যদি কারুর মনে কোনও সাড়া জাগে, তবে আমার রচনা সার্থক মনে করব।

নকুল মুখোপাধ্যায়

দেবতার পাহাড়

এক

মস্তবড় পাহাড়।

পাহাড়ের একদিকটা যেখানে নদীটার বুকের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, সেখান থেকে দেখলে মনে হবে পাহাড়টা ভয়ানক উঁচু।

পাহাড়টার অন্যদিকটায় বিরাট একটা খাদ। সোজা নেমে গেছে অনেক নিচে। মনে হবে পাহাড়ের খানিকটা কে যেন বাটালি দিয়ে কেটে নিয়েছে। সেই খাদের পরে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢেউ চলে গেছে অনেকদূর পর্যন্ত। শাল, মহুয়া আর কাঁটাগাছে ভরা সে পাহাড়গুলো। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, একটানা একটা জঙ্গল।

নদীটাও এসেছে এঁকেবেঁকে অনেক দূর থেকে। কোথায় যে তার শুরু কেউ বলতে পারে না। পাহাড়টার কাছে নদীটা বেশ চওড়া। নদীটার অন্য পাড় দিয়েও অনেকগুলো ছোট ছোট পাহাড়ের সারি চলে গেছে অনেকদূর পর্যন্ত।

বছরের বেশীর ভাগ সময়েই ঘুমিয়ে থাকে নদীটা। শুধু বর্ষার সাড়া পেয়ে জেগে ওঠে। প্রথম প্রথম ঝির্‌ঝির্‌ করে জল বয়ে চলে ওর বুকের ওপরে পড়েথাকা ছোট বড় পাথরের নুড়িগুলোর ওপর দিয়ে। তারপর বৃষ্টি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের বেগও বাড়তে থাকে। ভরা বর্ষায় ফুলে ওঠে নদীটা, হুড় হুড় করে জল নেমে আসে দূর পাহাড়ের গা থেকে। পাহাড় আর নদীর কোল ঘেঁষে যেসব জমিতে চাষ আবাদ করে স্থানীয় অধিবাসীদের দল, সেসব জমি ধীরে ধীরে ডুবতে শুরু করে। ভেসে যায় তাদের চাষ আবাদ।

মাঝে মাঝে হঠাৎ ঢল্ নামে। ক্রুদ্ধ গর্জন করে দূর থেকে জল ছুটে আসে বিরাট একটা দৈত্যের মত। সেই জলের তোড়ে মাঝে মাঝে ওদের কুঁড়েগুলোও ভেসে যায়। ভাসে গরু-ছাগল। কখনও কখনও দুএকটা লোকও মরে।

বর্ষাশেষে যখন ধীরে ধীরে জল নামতে থাকে তখন সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পাহাড়টার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় ওরা। ওদের বিশ্বাস, ঐ পাহাড়ে দেবতা আছে। সেই দেবতার রাগ হলেই নদীর জল অমন ফুলে ফুলে ওঠে, আর ওদের ঘর-বাড়ি-ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই প্রতি পূর্ণিমার রাতে ওরা এসে জড় হয় পাহাড়টার কোলে। বাজায় মাদল, বাজায় নানা বাদ্যযন্ত্র। সবাই মিলে একসঙ্গে হয়ে নাচে। নেচে দেবতাকে সন্তুষ্ট করে। প্রার্থনা জানায়, যাতে আগামী দিনগুলোতে ওদের যেন কোনও বিপদ না আসে। ওদের ছেলেপুলেরা যেন ভালভাবে মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

এমনি ভাবেই কেটে যায় ওদের দিনগুলো।

কোথা থেকে কবে যে ওদের পূর্বপুরুষেরা এখানে এসে বাসা বেঁধেছিল তা ওরা কেউ জানে না। হয়ত একদিন কোনও এক যাযাবরের দল ঘুরতে ঘুরতে নদীটার ধারে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটুকরো সবুজ জায়গা দেখে একটা আস্তানা গেড়েছিল। বসিয়েছিল তাদের ঘর সংসার। তারপর একদিন সে সংসার বড় হল। নিজেদের মধ্যে বিয়ে-থা হল। লোক বাড়ল। ছোট্ট গোষ্ঠী হয়ে উঠল একদিন লোকালয়। সেই সঙ্গে বাড়ল গরু ছাগল ভেড়া। চাষের জমিও বাড়ল। তৈরী হল আরও অনেক কুঁড়ে। পাহাড়ের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তারা।

এখানকার সর্দার এখন লখন সিং। বয়স এখন পঞ্চাশ হবে। সুঠাম, মজবুত চেহারা। দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে লোকটার অত বয়স হয়েছে।

ছোট্ট সংসার লখন সর্দারের। বউ তার মারা গেছে মুংলী জন্মাবার কিছু পর। বছর খানেক বোধহয় বয়স ছিল তখন মুংলীর। হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মারা গেল। সেই থেকে সর্দার মুংলীকে একাই মানুষ করেছে।

মুংলীর এখন বয়স প্রায় কুড়ি। মুংলীকে সর্দার বিয়ে দিয়েছিল বুধনের সাথে। শক্ত, জোয়ান ছেলে ছিল বুধন। ভয় ডর ছিল না। নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে সে এগিয়ে যেত শত বিপদের মাঝে। কিন্তু কেমন করে যে সে একদিন এই পাহাড়ের কোলে নিখোঁজ হয়ে গেল কেউ বলতে পারল না! মুংলীর কোলে রেখে গেল সে দুবছরের শিশু ঝুমরুকে।

ঝুমরুর এখন বয়স চার। ভীষণ দুষ্টু ছেলে। বাপের মতই সুন্দর মুখখানা সে পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যও। ঝুমরুর দুরন্তপনায় সর্দার মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভাবে, বাপের মত সেও না একদিন এই পাহাড়ের কোলে নিখোঁজ হয়ে যায়!

সকলের মত সর্দারও চাষ-আবাদ করে, ছাগল ভেড়া পোষে। মুংলী করে ঘরের কাজ। সবার মত তাদের দিনগুলোও সুখে দুঃখে এগিয়ে চলে এক এক করে।

একদিন ওদের ঐ গতানুগতিক জীবনে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। ওরা দেখল, একদিন নদীটার ওপারে এল কতগুলো লোক। নানা রকম যন্ত্রপাতি আনল তারা। তৈরী হতে লাগল ছোট বড় অনেক ঘর। এগুলো তাদের মত কুঁড়ে ঘর

নয়। বড় বড় দু একটা ইঁটের বাড়িও উঠল। তারপর এল বড় বড় গাড়ি, আর গাড়ির মতই কি সব। ঘর্ ঘর্ তাদের আওয়াজ। ভট্ ভট্ তাদের শব্দ। তারপর এক সময়ে নদীর বুকে ওরা কি সব যেন বানাতে শুরু করল। ক্রমে ক্রমে উঁচু হতে লাগল সে জিনিষটা। মনে হল নদীটার বুকে আড়া-আড়ি ভাবে তারা একটা পাঁচিল তুলে দিল।

দিনরাত্রি কাজ চলতে লাগল সে নদীর বুকে। লোকজন আরও এল। এল বড় বড় সব যন্ত্রপাতি। বড় বড় তার শুঁড়ে ঝুলছে লম্বা লম্বা লোহার শেকল। কি ভারী ভারী জিনিষগুলোকে টেনে তুলছে ওরা ঐ লম্বা শুঁড়গুলো দিয়ে? ঘরবাড়ি আরও উঠল অনেক। লোকজন আরও বাড়ল। গম্ গম্ করতে লাগল চারদিক। অবাক হয়ে ওরা শুধু দেখতে লাগল দিনের পর দিন।

একদিন কয়েকজন বাবু ওদের কাছে এল। এসে বলল—'নদীটায় আমরা বাঁধ দেব। বর্ষার জল আট্‌কে রাখব! এতে তোমাদের ঘর-বাড়ি-ক্ষেত ভাসবে না। বার মাস চাষ-আবাদ করবার জন্য জল পাবে। এই জলের মুখ ঘুরিয়ে আমরা পাহাড়টার ওপারে নিয়ে গিয়ে ফেলব। সেখানে বসবে বিজলি তৈরীর কল। সেই বিজলিতে কারখানা চলবে। তোমাদের ঘরেও বিজলির বাতি জ্বলবে। তারপর ওপারের সেই জলকে আমরা নালা তৈরী করে নিয়ে যাব অনেক দূরে, যেখানে জলের অভাবে লোকেরা চাষ-আবাদ করতে পারে না। এতে তোমাদের সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এতবড় কাজটা করতে হলে আমাদের অনেক লোকের দরকার। তোমরা সবাই এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। আমাদের সাহায্য কর।'

বড় বড় চোখ করে কথাগুলো শুনল সবাই। তারপর তাকাল সর্দারের দিকে।

সর্দারও কি সব ভাবল একটু। তারপর বলল,—'বেশ তো, এসবে যদি আমাদের ভাল হয়, তবে আমরা নিশ্চয়ই কাজ করব।'

লেগে গেল ওরা কাজে। একটা নতুন সাড়া জাগল ওদের মনে। বর্ষায় নদীটা আর ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে ওদের ঘর-বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না। শুকনোর দিনে ক্ষেতের কাজ ফেলে ওদের দূরে সহরে গিয়ে মজদুরী করতে হবে না। তাছাড়া এ কাজে কিছু পয়সাও উপার্জন করবে তারা। বাবুরা ভাল পয়সাই দিচ্ছে কাজে। এরকম তারা কখনও আশা করতে পারেনি।

খুব উৎসাহভরে ওরা কাজ করে চলল দিনের পর দিন। একটু একটু করে উঁচু হতে লাগল বাঁধটা। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল।

একদিন বাঁধটা উঁচু হতে হতে পাহাড়টার প্রায় বুকের কাছে এসে ঠেকল। ,বাবুরা বলল—বাঁধটা এখন আর উঁচু করা হবে না। এবার পাহাড়টাকে ফুটো করতে হবে। করে বাঁধে জমান জলকে পাহাড়টার ওদিকে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে। তারপর শুরু হবে অন্যান্য কাজ।

বাবুদের কথা শুনে সব উৎসাহ নিভে গেল ওদের। বলে কি বাবুরা। এই পাহাড়ের বুক ফুটো করবে! ফুটো করে এই জমান জল পাহাড়টার ওদিকটাতে নিয়ে গিয়ে ফেলবে! কিন্তু এ যে দেবতার পাহাড়!

সেই রাত্রেই সব জড় হল এসে সর্দারের কুঁড়ের সামনে। জল্পনা কল্পনা হল অনেক। সবাই একবাক্যে বলল, এ

অসম্ভব প্রস্তাব। পাহাড়ের বুকে তারা বাঁধ তুলতে দিয়েছে, তাই বলে তারা পাহাড়ের বুক ফুটো করতে দিতে পারে না।

সবাই তাকাল সর্দারের দিকে। সর্দারেরও ঐ এক মত। পাহাড়টা তাদের দেবতা। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে তারা এই পাহাড়কে পূজো করে আসছে। এই পাহাড়ের বুক সে কিছুতেই ফুটো করতে দিতে পারে না।—আর বাঁধ? দেবতার ক্রোধ হলে এই বাঁধ ভেঙ্গে যেতে কতক্ষণ! দেবতার সঙ্গে কি মানুষ পারে? ঐ তো বুধন, মানতো না যে এ পাহাড়ে দেবতা আছে। কিন্তু সেই দেবতাই তো ওকে একদিন নিয়ে নিল।

কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন জাগল ওদের মনে। ঐ বাবুদের তো অনেক লোক, অনেক সব যন্ত্রপাতি। বাবুরা যদি ওদের কথা না শুনে পাহাড় ফুটো করতে শুরু করে দেয়?

'সে পরে দেখা যাবে।' বলল লখন সর্দার। দেবতার শক্তির কাছে ওদের শক্তি কিছুই নয়। হতে পারে ওদের লোকজন বেশী। হতে পারে ওদের যন্ত্রপাতি অনেক। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছে দেবতার আশীর্বাদ।'

সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল—'জয়, কপিলেশ্বরের জয়।'

ঠিক হল, আপাততঃ ওরা কয়েকদিন চুপচাপ থাকবে। কাজেও যাবে না। দেখবে, বাবুরা সত্যি সত্যিই পাহাড়টা ফুটো করে কিনা।

কয়েক দিন পর।

তখন সকাল। ফুর ফুর করে বইছে মিষ্টি হাওয়া। হাওয়াটা একটু যেন ভিজে ভিজে। বোধহয় দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে, তারই কিছু জলকণা ভেসে আসছে হাওয়ায় ভর করে। ওরা জানে, এটা বর্ষার পূর্বাভাস। অবশ্যি ভরা

বর্ষা নামতে এখনও অনেক দেরী আছে। মুংলী তাই ঘরের চালের খড়গুলো একটু ঠিক করে নিচ্ছে। এদিক ওদিক ঘুরে ক্ষেতের গাছগুলোকে তদারক করছে সর্দার। ঝুমরু তার প্রিয় ছাগলটাকে নিয়ে এখানে ওখানে ছুটোছুটি করছে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠল সবাই! মনে হল, পাহাড়ের বুকে বুঝি একটা বাজ পড়ল।



ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল সবাই সর্দারের কাছে। তারপর বিস্ময়ে তাকাল পাহাড়টার দিকে।—দেখল, পাহাড়টার সঙ্গে যেখানে বাঁধটা এসে মিশেছে, সেখান থেকে উঠছে এক রাশ ধোঁয়া। তারপর পাক খেতে খেতে সে ধোঁয়া আকাশে মিলিয়ে গেল।

শঙ্কিত হল সবাই। এ ওর মুখের দিকে চাওয়া-চায়ি করতে লাগল।—তবে কি বাবুরা পাহাড়ের বুক ফুটো করতে শুরু করে দিল ?

সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল চার দিকে। ছুটে এল আরও অনেকে। এসে সব ভিড় করে দাঁড়াল সর্দারের চারদিকে। মুংলীও ঝুমরুকে কোলে করে এসে একপাশে দাঁড়াল।

ধোঁয়াটা কেটে যেতে সবাই দেখল, পাহাড়টার বুকের কাছে কালো একটা গর্ত। তার সামনে কয়েকজন বাবু দাঁড়িয়ে। কিছু শ্রমিকের দলও রয়েছে তাদের পাশে, হাতে তাদের গাঁইতি, শাবল। একটু পরে ওরা এগিয়ে এল গর্তটার কাছে। সবাই মিলে গাঁইতি, শাবল চালাল গর্তটার ওপর। তারপর টেনে বের করল কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঁই। সে চাঁইগুলোকে তারা গড়িয়ে দিল পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের দিকে। নদীর বুকে পড়ে সে চাঁইগুলো খান্ খান্ হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল সব। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সর্দার। পাহাড়ের বুক তাহলে বাবুরা ফুটো করতে আরম্ভ করেছে! তাকাল সে সবার দিকে।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সবাই। না না, এ অসম্ভব। বাবুদের এ অত্যাচার তারা সহ্য করবে না। তাদের দেবতাকে তারা এভাবে অপমানিত হতে দেবে না। জান দিয়ে তারা রুখবে বাবুদের।

ওদের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠল—'জয়, কপিলেশ্বরের জয়।' সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'জয়, কপিলেশ্বরের জয়।' পাহাড়ের কোলে সে জয়ধ্বনি কেঁপে কেঁপে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

দুই

দেয়ালে টাঙ্গান বাঁধের প্ল্যানটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল সুকান্ত। ভাবছিল অনেক কথা। কয়েকদিন হল সে এখানে এসেছে। এমনভাবে হঠাৎ তাকে আসতে হত না। রামমূর্তির শোচনীয় মৃত্যুর জন্যেই তার এখানে আসা।

রামমূর্তির জন্যে ভাবলে সত্যিই দুঃখ হয়! কি-ই বা বয়েস হয়েছিল তার! একই সঙ্গে কলেজে পড়ত সুকান্ত আর রামমূর্তি। একই সঙ্গে পাশ করল। রামমূর্তি মাদ্রাজি হলেও কলকাতাতে ওদের অনেকদিনের বাস। কলকাতার এক বড় অফিসে ওর বাবা কাজ করেন।

কলেজ ছেড়ে দুজনেই কাজ নিয়েছিল এই 'ন্যাশানাল কন্‌স্‌ট্রাক্‌শান কোম্পানীতে'। মস্ত বড় কোম্পানী। সারা ভারত জুড়ে এদের কাজ। এখানকার কাজ শুরু হবার কিছুদিন পরেই কোম্পানী রামমূর্তিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল এখানে। কোম্পানীর মস্তবড় পরিকল্পনা ছিল এই বাঁধটাকে ঘিরে।

রামমূর্তি এখানে এসে কাজ শুরু করেছিল খুব উৎসাহের সঙ্গে। কোম্পানী থেকে সুখ্যাতিও পেয়েছিল প্রচুর। কাজে উন্নতিও করেছিল। কিন্তু এমনভাবে হঠাৎ যে ওর জীবনটা শেষ হয়ে যাবে, কেউ ভাবতেও পারেনি!

একে অসাবধানতাও ঠিক বলা যায় না। বোধহয় একটু অন্যমনস্কই হয়েছিল সেদিন রামমূর্তি। বাঁধটার ওপর দিয়ে সে আনমনা ভাবেই হেঁটে চলছিল। হঠাৎ কি করে নিচে পড়ে গেল কেউ বুঝতে পারল না! লোকজন ছুটে এসেছিল

সবাই, কিন্তু বাঁচান গেল না। একটা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথাটা ওর থেঁতলে গিয়েছিল। কোম্পানী খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিল ওর মৃত্যুতে। কিন্তু ওর বাপ-মার মন তাতে শান্ত হয়নি।—ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সুকান্ত।

কলকাতায় একসঙ্গে কাজ করবার সময়ে কত গল্পই না করত রামমূর্তি! তার গ্রামের কথা, দেশের কথা, নিজের ভবিষ্যতের কথা। কত রঙীন কল্পনাই না সে করত আগামী দিনগুলোর কথা স্মরণ করে! কিন্তু এক মুহূর্তের অসাবধানতায় সব শেষ হয়ে গেল।

রামমূর্তির জায়গায় কোম্পানী ঠিক করল সুকান্তকে পাঠাবে। প্রথম প্রথম সুকান্ত আপত্তি জানিয়েছিল। এ সময়ে ললিতাকে ছেড়ে সে কি করে এখানে আসতে পারে? ললিতা যে মা হতে চলেছে! এই তাদের প্রথম সন্তান। হয়ত আর মাস দেড়েকও লাগবে না নতুন অতিথি ঘরে আসতে। কিন্তু সুকান্তকে আসতেই হল। রামমূর্তির জায়গায় এখানে পাঠাবার মত আর কোনও ইঞ্জিনিয়ার সে সময়ে পাওয়া গেল না।

চলে আসবার সময়ে ললিতাকে প্রবোধ দিয়েছিল সুকান্ত, ভয় কি, মা তো রইলেন। তাছাড়া ডাঃ সেনকেও বলে গেলাম। তিনি নিয়মিত এসে দেখে যাবেন। কিন্তু সুকান্ত জানত যে মাকে দিয়ে বিশেষ কাজ হবে না। মা তার নির্লিপ্ত মানুষ। বাবা মারা যাবার পর মা কেমন যেন উদাসীন হয়ে গেলেন। দিনরাত কেবল পূজো আর ঠাকুর নিয়েই থাকেন।

তবুও চলে আসতে হয়েছিল সুকান্তকে। এ কাজের

দায়িত্বও বড় কম নয়। একা ললিতার জন্যে তো আর সে এতবড় দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না!

এখানে এসে তিন চারখানা চিঠিও লিখেছে সুকান্ত। কিন্তু এখনও কোন জবাব পায়নি। হয়ত ললিতার শরীরটা ভাল নয়, তাই লিখতে পারেনি। কিংবা হয়ত চিঠি আসতেই দেরি হচ্ছে। যা জঙ্গল আর পাহাড়ের দেশ!

বড় করে সিগারেটটা টেনে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল সুকান্ত। তারপর জানলাটা দিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। বাইরের আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে। দূরে পাহাড়টার গায়ে পড়েছে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা। চমৎকার দেখাচ্ছে পাহাড়টাকে। এক ঝাঁক বুনো পাখী পাহাড়টার গা ঘেঁষে উড়ে গেল। তাদের সাদা পাখার ওপরে সূর্যের লাল আভা পড়ে চমৎকার দেখাচ্ছিল। পাখীগুলোকে চেনে না সুকান্ত। কিন্তু বেশ লাগছিল তার পাখাগুলোর দিকে ওভাবে চেয়ে থাকতে।

পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে সুকান্তর হঠাৎ মনে পড়ে গেল মুংলীর কথা। অদ্ভুত মেয়েটা! একদিন ঐ পাহাড়টাতে বেড়াচ্ছিল সুকান্ত। হঠাৎ দূরে দেখল, একটা মেয়ে আনমনা পাহাড়টাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুকান্তকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। মেয়েটাকে ইসারায় ডেকেছিল সুকান্ত। ভেবেছিল, ছোট মেয়েটার সঙ্গে একটু ভাব জমিয়ে নিয়ে এখানকার এই পাহাড়ি লোকেদের সম্বন্ধে কিছু জেনে নেবে সে।

ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল মুংলী। ভুল ভেঙ্গেছিল সুকান্তর। মুংলীকে সে যতটা ছোট ভেবেছিল, ততটা

ছোট মুংলী নয়। একটু কেমন লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল সুকান্ত।

মুংলী কিন্তু কাছে এসে সহজভাবেই প্রশ্ন করেছিল সুকান্তকে—'ডাকছ কেন ?'

'না মানে, তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করব বলে।' একটু থতমত খেয়েই উত্তর দিয়েছিল সুকান্ত।

ডুটো ডাগর চোখ তুলে মুংলী তাকিয়েছিল সুকান্তর দিকে। তারপর বলেছিল, 'তুমি বুঝি এখানে নতুন এসেছ ?'

'হ্যাঁ', একটু মিষ্টি হেসে জবাব দিয়েছিল সুকান্ত।

'আমার নাম মুংলী।' একটু হেসেই জবাব দিয়েছিল মুংলী। 'আমার বাবার নাম লখন সিং। সে এখানকার সর্দার। তারপর ভ্রূ ডুটোকে একটু কুঁচকে বলেছিল, কিন্তু তোমরা এ পাহাড়টাতে বাঁধ দিচ্ছ কেন ?—এ তো দেবতার পাহাড়।'

'দেবতার পাহাড় !' আশ্চর্য হয়ে বলেছিল সুকান্ত। 'কিন্তু দেবতা কোথায় ?' বলে এদিক ওদিক তাকিয়েছিল সে।

'এ দেবতাকে দেখা যায় না।' গম্ভীর হয়েই জবাব দিয়েছিল মুংলী। 'এ দেবতা খুব জাগ্রত। একটু ক্রোধ হলেই সে মানুষের জান্ নিয়ে নেয়।'

'তাই বুঝি !' বলে একটু কৌতুকের হাসি হেসেছিল সুকান্ত।

সুকান্তর হাসি দেখে মুংলীর কিন্তু মুখটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। সুকান্ত বুঝল, মুংলীর উত্তরটা ঠিক পছন্দ হয়নি। কথা ঘুরিয়ে সুকান্ত বলেছিল—'তুমি কিছু মনে কোরো না। আমিও শুনেছি, তোমাদের এ পাহাড়ে দেবতা আছে।'



উত্তরে কিন্তু মুংলী কোনও কথা বলেনি। একবার শুধু সুকান্তর দিকে তাকিয়েছিল, তারপর চলে গিয়েছিল অন্য দিকে। সুকান্ত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ওর যাবার পথের দিকে চেয়ে।

সুকান্ত ভাবতে লাগল মুংলীর কথা। অদ্ভুত লেগেছিল সেদিন মেয়েটাকে। বয়স বোধহয় কুড়ি একুশ হবে। সুন্দর সুঠাম শরীর। চেহারায় বেশ একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু চোখ দুটো কেমন বিষাদময়। সুকান্ত লক্ষ্য করেছিল, যতক্ষণ মুংলী কথা বলছিল তার সঙ্গে, তার চোখ দুটো যেন এদিক ওদিকে কি খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

সেদিনের পর আরও কয়েকবার দেখা হয়েছিল সুকান্তর মুংলীর সঙ্গে। কিন্তু সুকান্তকে দেখে দূর থেকেই হেসে পালিয়ে গিয়েছিল মুংলী। শুধু একবার এসে কথা বলেছিল। বলেছিল ঝুমরুর কথা। বলেছিল তার দুরন্তপনার কথা।

ঘড়ির দিকে তাকাল সুকান্ত। নাঃ আর বসে বসে ভাবলে চলবে না। সূর্যটা ডুবে গেছে। আকাশের রঙ কালো হয়ে এসেছে। সন্ধ্যের আগেই মিঃ যোশীর ওখানে যাবার কথা আছে।

মিঃ যোশী এখানকার চিফ্ ইন্জিনিয়ার। সব কাজগুলোই তাঁর নির্দেশে হচ্ছে। সকালে মিঃ যোশী বলছিলেন, ঐ পাহাড়টায় সুড়ঙ্গ তৈরীর কথা। সকালে 'ডিনামাইট' দিয়ে পাহাড়ের কিছুটা অংশ ফাটানও হয়েছে। এবার নিয়মিতভাবে কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর সে কাজের দায়িত্ব পড়েছে সুকান্তেরই ওপর। বর্ষা আসতে এখনও দেরী আছে। বাঁধের মুখে জল জমবার আগেই ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে বাঁধের জলকে

পাহাড়ের ওদিকটাতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে। ওদিকের কাজগুলোও এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

জ্বলন্ত সিগারেটটা জুতোয় চেপে নিভিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সুকান্ত। তারপর ব্রাকেট থেকে কোটটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে ঢুকল মুংলী।

মুংলীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সুকান্ত। বলল, 'তুমি এখানে!'

মিষ্টি করে হাসল মুংলী। বলল—'এমনিই এলাম।' বলে একটু লজ্জায় মাটির দিকে চোখ নামাল সে।

—'কিন্তু এই ঘরে, আমি একলা! কেউ যদি দেখে ফেলে?' একটু বিব্রত ভাবেই বলল সুকান্ত।

—'আমাকে এখানকার সবাই জানে। তোমার কোনও ভয় নেই।'—বলে দুষ্টুমির হাসি হাসল মুংলী। তারপর হাসতে হাসতেই বলল—'তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে এলাম।'

—'আমার সঙ্গে!'—আশ্চর্য হল সুকান্ত।

—'কেন, বলা যায় না বুঝি?'—কপাটের পাল্লা দুটো ধরে বাঁকা চোখে তাকাল মুংলী সুকান্তর দিকে।

—'না না, বলা যাবে না কেন?' সহজ হতে চাইল সুকান্ত। 'কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার কি এমন কথা!'

'তোমরা নাকি ঐ পাহাড়টা ফুটো করতে আরম্ভ করেছ?'—সহজভাবেই বলল মুংলী।

—'হ্যাঁ।' বলল সুকান্ত।

—'কিন্তু সেদিন যে তোমাকে বললাম, এ পাহাড়ে আমাদের দেবতা আছে।'—একটা কঠিন স্বর মুংলীর কণ্ঠে।

—'কিন্তু পাহাড়টা যে ফুটো করতেই হবে। এটা যে বাঁধেরই একটা কাজ।'—সুকান্তও বলল গম্ভীর ভাবে।

দরজাটা ধরে একটুক্ষণ কি যেন ভাবল মুংলী। তারপর প্রশ্ন করল—'পাহাড়টাকে ফুটো করে কি হবে?'

—'এই বাঁধের জমান জলকে ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে পাহাড়ের ওধারে ফেলা হবে।' বিজ্ঞের মত বলল সুকান্ত।

—'তারপর?'

—'তারপর সেখানে বসবে বিজলী তৈরীর কল। সে বিজলী দিয়ে কত কারখানার কাজ চলবে।'

—'কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ হবে?'

হাসল সুকান্ত। বলল—'লাভ? তোমাদের লাভের জন্যেই তো এসব করা। এসব অঞ্চল জুড়ে যখন বড় বড় কারখানা তৈরী হবে, তখন তোমাদের ছেলেমেয়েরাই তো সে কারখানায় কাজ করবে। সে কারখানার আশেপাশে সহর গড়ে উঠবে। সেখানে ইস্কুল হবে। সেই সব ইস্কুলে তোমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে। তারা বড় হবে। তারা মানুষের মত বাঁচতে পারবে।'

আবার একটু কি যেন ভাবল মুংলী। তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করল—'কিন্তু দেবতা? দেবতার কি এতে রাগ হবে না?' কেমন যেন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেল মুংলী।

আবার হাসল সুকান্ত। বললে—'দেবতা থাকলে তো রাগ করবে? দেবতা পাহাড়ে থাকে না।'

এবার বড় বড় চোখ করে তাকাল মুংলী সুকান্তর দিকে। 'পাহাড়ে দেবতা নেই!'

—'না, পাহাড়ে দেবতা থাকে না।' বেশ জোরের সঙ্গেই

বলল সুকান্ত।—'দেবতা থাকে তোমার আর আমার মাঝে। আমাদের সবার মাঝে।'

কেমন যেন অবাক হয়ে গেল মুংলী! একটা শূন্যদৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে রইল সুকান্তর দিকে। বলে কি লোকটা! এ পাহাড়ে দেবতা নেই! দেবতা আছে তার আর সুকান্তর মাঝে! সকলের মাঝে! তারপর একসময়ে নিজের মনেই যেন বলল—'বুধনও ঠিক এরকম বলত। সেও দেবতাকে মানত না।'

—'কে বুধন?' প্রশ্ন করল সুকান্ত।

—'আমার মরদ।' বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মুংলী। সুকান্ত লক্ষ্য করল, চোখদুটো যেন তার আবার বিষাদময় হয়ে উঠল। এতক্ষণের সে হাসি হাসি ভাবটা আর নেই।

—'কি বলত সে?' প্রশ্ন করল সুকান্ত।

বলল মুংলী—'ও বিশ্বাস করত না যে এ পাহাড়ে দেবতা আছে। বলত, দেবতা যদি থাকে তবে তাকে দেখা যায় না কেন? একদিন সে দেবতাকে খুঁজতে পাহাড়ে গেল। আর ফিরে এল না।'

এবার যেন চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করে উঠল মুংলীর। মাটির দিকে চোখ নামাল সে।

—'আর ফিরলই না!'—অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সুকান্ত।

—'না, আর ফিরল না।' গলাটা এবার ভারি হয়ে এল মুংলীর। সুকান্ত লক্ষ্য করল, মুংলীর চোখের কোণ দুটো জলে চিক্‌চিক্‌ করছে।

—'কেউ তাকে খুঁজলও না?' প্রশ্ন করল সুকান্ত।

—'অনেক খুঁজল সবাই মিলে। কিন্তু কেউ পেল না।' মাটির দিকে মুখ করেই কথা ক'টা বলল মুংলী। তারপর একটা

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল—'বাবা বলে, দেবতাকে ও অশ্রদ্ধা করত, দেবতাকে ও মানত না, তাই দেবতা ওকে নিয়ে নিল।'

চুপ করে বসে রইল সুকান্ত। কি বলবে সে? কি-ই বা তার বলবার আছে এখন!

একটু ইতস্তত করে মুংলী বলল—'তুমি ঐ পাহাড় ফাটানর কাজে থেক না বাবু। দেবতার ক্রোধ তোমার ওপরেও গিয়ে পড়বে।'

সুকান্ত তাকাল মুংলীর দিকে। মেয়েটাকে দেখলে কেমন মায়া হয়। প্রবোধ দিয়ে বলল সুকান্ত—'না না, দেবতা আমার ওপরে রাগ করবেন কেন? আমি তো আর কোনও খারাপ কাজ করছি না?'

—'কিন্তু দেবতার বুক ফুটো দেবতা কিছুতেই সহ্য করবে না।' এবার বেশ সহজভাবেই বলল মুংলী। 'এই তো সেদিন তোমাদের এক বাবু, বাঁধের ওপর থেকে নিচে পড়ে গেল। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। একটা পাথরে লেগে মাথাটা একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল। দেবতার বুকের ওপরে বাঁধ দেওয়া দেবতা সহ্য করেনি।'

সুকান্ত বুঝল, মুংলী রামমূর্তির কথা বলছে।

ঘড়ির দিকে তাকাল সুকান্ত। নাঃ, আর কথা বলবার সময় নেই। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মিঃ যোশী নিশ্চয়ই তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। মিঃ পাণ্ডে আর মিঃ গোখ্‌লেরও আসবার কথা আছে।

উঠে দাঁড়াল সুকান্ত। তারপর মুংলীর কাছে এগিয়ে এসে বলল—'তুমি এবার যাও মুংলী। আমার এখুনি একটু কাজে বেরুতে হবে। তুমি মাঝে মাঝে এস। গল্প করব।'

একটা ব্যথাভরা দৃষ্টি তুলে মুংলী তাকাল সুকান্তর দিকে। তারপর কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল।

সুকান্তও এল পিছু পিছু। এসে দরজাটা টেনে তালা লাগিয়ে দিল।

—'আচ্ছা বাবুজি চলি,' মিষ্টি করে হেসে ফিরে তাকাল মুংলী সুকান্তর দিকে।

সুকান্তও ঘুরে দাঁড়াল মুংলীর দিকে। বলল—'একলা যেতে পারবে? চারদিকে যে অন্ধকার হয়ে এল।'

—'কোথায় অন্ধকার?' হাসল মুংলী। 'ঐ তো আকাশে কত বড় চাঁদ। চারদিক তো বেশ পরিষ্কার। আমি একলা বেশ যেতে পারব। চাঁদিনী রাতে পথ চলা আমার খুব অভ্যেস আছে।'

'তাই বুঝি?' সুকান্ত হাসল। তারপর বলল—'আমার কিন্তু এসময়ে অতটা পথ একলা যেতে খুব ভয় করবে।'

খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল মুংলী। বলল—'তোমরা সহরের লোক কিনা তাই!'

—'না না, আমি তো এখন তোমাদেরই একজন হয়ে গেছি।' সুকান্তও হাসল। 'আমিও একদিন চেষ্টা করব এভাবে চাঁদিনী রাতে এদিকটা হেঁটে বেড়াতে।'

—'আচ্ছা বাবু, আজ চলি।' বলে হঠাৎ যেন কি ভেবে মুংলী হন্‌হন্ করে এগিয়ে গেল বাঁধটার ওপর দিয়ে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সুকান্ত ওর যাবার পথের দিকে। মনে মনে ভাবল, অদ্ভুত মেয়েটা!

তিন

ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্, ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্। দূর থেকে ভেসে আসছে মাদলের আওয়াজ।

শুয়েছিল সুকান্ত। আওয়াজটা অনেকক্ষণ ধরেই কানে আসছিল। ঘুমও আসছিল না তার। নানা রকম চিন্তা মাথার মধ্যে কেবল জট পাকাচ্ছিল। বিছানা থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল সুকান্ত।

রাত অনেক হয়েছে। চাঁদটা মাথার ওপর। চারদিক ভরা জ্যোৎস্না। যতদূর দেখা যায়, মনে হয় তুলি দিয়ে কে যেন একটা ছবি এঁকে রেখেছে।

সুকান্ত তাকাল পাহাড়টার দিকে। বাঁধটা যেখানে পাহাড়টার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, তারই নিচে জ্বলছে কতগুলো মশাল। মনে হচ্ছে, অনেক লোকও জড় হয়েছে সেখানে। মশালের লাল আলো আর আবছা অন্ধকারে লোকগুলোকে মনে হচ্ছে, ওরা বুঝি এ পৃথিবীর জীব নয়! বাজনাটা ভেসে আসছে সেখান থেকেই।

সুকান্ত শুনেছে, প্রতি পূর্ণিমার রাতে এইসব অধিবাসীদের দল এসে জড় হয় ঐ পাহাড়টার কোলে। হয়ে নাচে, গান করে। নাচগান করে পাহাড়টাকে শ্রদ্ধা জানায়। পাহাড়টা নাকি ওদের দেবতা!

লখন সর্দারও সেই কথা বলছিল। সন্ধ্যেবেলা মিঃ যোশীর কোয়ার্টারে সুকান্ত যখন গিয়েছিল তখন লখন সর্দারও সেখানে ছিল। সুকান্ত চিনত না। মিঃ যোশীই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

লখন সর্দার বলছিল—দেবতার স্থানে তারা বাঁধটা উঠতে দিয়েছে, তাই বলে তারা পাহাড়ের বুক ফুটো করতে দিতে পারে না! সর্দারকে বুঝিয়েছিলেন মিঃ যোশী, কিন্তু সর্দার বুঝতে চায়নি। পরে অবশ্যি বলে গেছে যে তার লোকের মতামত নিয়ে সে আবার এসে খবর দিয়ে যাবে।

সত্যিই আশ্চর্য লোকগুলো! ভাবে সুকান্ত। এখনও সেই কোন অন্ধকারে পড়ে আছে! পৃথিবীর কত দেশ কত দিক দিয়ে এগিয়ে গেল, আর এরা সেই কোথায় পিছিয়ে পড়ে রয়েছে! পাহাড় বুঝি আবার দেবতা হয়! আশ্চর্য কুসংস্কার! অথচ লোকগুলো এইসব বিশ্বাস করে! এমনকি মুংলীও বিশ্বাস করে যে এই পাহাড়ের দেবতাই তার বুধনকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে!

ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্, ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্। থেমে থেমে আওয়াজটা ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে হাওয়াটা বুঝি থর থর করে কেঁপে উঠছে সে আওয়াজে। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে সে আওয়াজের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে দূর-দূরান্তে। এদিকে চাঁদের আলো চারদিকে একটা স্বপ্নের জাল রচনা করে রেখেছে। হাতঘড়িটা দেখল সুকান্ত। রাত সাড়ে বারটা।

হঠাৎ ললিতার কথা মনে পড়ে গেল। কি করছে ললিতা এখন? নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিংবা হয়ত তারই মত জেগে বসে ভাবছে নানা কথা। ওদের ঘরে নতুন অতিথি আসবে, অথচ সে অতিথিকে সম্বর্ধনা করে ঘরে আনবার জন্য সুকান্ত উপস্থিত থাকবে না। ললিতাকেই একা সব করতে হবে। মাকে জানে সুকান্ত। তিনি হয়ত সব কিছু এড়িয়েই

থাকবেন। পূজো আর ঠাকুর নিয়েই তিনি ব্যস্ত। কি যে আছে ঐ পাথরের নুড়িতে!

ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্, ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্! বেশ তালে তালে বাজছে মাদলগুলো। সেই সঙ্গে বাজছে আরও কি সব যেন যন্ত্র। বেশ ঝুম আছে সে বাজনায়। মনে যেন একটা নেশা ধরিয়ে দেয়।



মনে মনে ভাবে সুকান্ত—একবার ওখান থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়? দেখে আসতে পারে, কেমন ওরা নাচে, কেমন গান গায়। কিন্তু সুকান্ত শুনেছে যে প্রায় রাতেই এসব অঞ্চলে চিতাবাঘ আর বুনো শুয়োর বেরয়। গান শুনতে গিয়ে শেষে চিতাবাঘের হাতে প্রাণটা যাবে?

বারান্দায় আর দাঁড়াল না সুকান্ত। রাত অনেক হয়েছে। একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। কাল সকাল থেকেই আবার তোড়জোড় শুরু হয়ে যাবে। মিঃ যোশী সব 'প্ল্যান' করে দিয়েছেন, কি ভাবে সুড়ঙ্গটা তৈরী হবে। কি ভাবে সেটা বেঁকে পাহাড়ের ওধারে চলে যাবে। শ্রমিকদের নিয়ে হয়ত কিছু গোলমালও হতে পারে! মিঃ যোশী বলছিলেন, লখন সর্দারের দল যদি শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসে তবে হয়ত সহজভাবে কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু তাই বলে তো আর কাজ আটকে পড়ে থাকতে পারে না! দরকার হলে দূর গ্রাম থেকে লোক আনতে হবে। আর তাতে যদি দু' দলের মধ্যে ঝগড়া বা মারামারি হয়, তবে কি-ই বা করা যেতে পারে? যাই হোক, খুব সাবধানে এগুতে হবে। আর সুকান্তকেই সব দিক সামলিয়ে নিতে হবে।

ধীরে ধীরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল সুকান্ত। শুয়ে একটা সিগারেট ধরাল। মাথার মধ্যে জটগুলো যেন কিছুতেই ছাড়ছে না। মুংলীর কথা আবার মনে পড়ল।

বুধনের জন্যেই নিশ্চয় মেয়েটা অমন মনমরা হয়ে থাকে! ওর চোখ দুটোর দিকে তাকালে কেমন যেন মায়া হয়! মনে হয়, ওর মনে অনেক কথা আছে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারছে না। কিন্তু ও তো আবার বিয়ে করতে পারে! ওদের মধ্যে তো এরকম হয়! রামদীনই তো বলছিল তাকে কয়েক-দিন আগে এসব কথা।

রামদীন সুকান্তর চাপরাশি। এদিকেরই একটা গাঁয়ের লোক। এই বাঁধ শুরু হবার সময় থেকেই সে এখানে আছে। দিনেরবেলা বাঁধের অফিস সংক্রান্ত নানা কাজ করে আর রাতে

সুকান্ত আর মিঃ পাণ্ডের রান্নাবান্না করে দেয়। থাকে কাছাকাছিই একটা 'ব্যারাকে'।

বৌটি তার মারা গেছে বছর দু'য়েক হল। একটা বাচ্চা হতেই মরল বৌটা। বাচ্চাটাকেও বাঁচান গেল না। রামদীন একবার সর্দারের কাছে পেড়েছিল কথাটা। বুধন তখন মাস তিন চার হবে মারা গেছে। সর্দারের মনেও একবার ইচ্ছে জেগেছিল—আহা, মেয়েটা যদি একটু সুখ পায়, একটু শান্তি পায়। কিন্তু মুংলীই এড়িয়ে গেছে সব ব্যাপারটা। সর্দারের কথাও সে শোনেনি।

কিন্তু রামদীনকে বিয়ে করলে বোধহয় সুখীই হত মুংলী। বেশ লাগে সুকান্তর রামদীনকে। বেশ শক্ত চেহারা। মুখে সব সময়ে হাসি লেগে আছে। সুকান্ত লক্ষ্য করেছে, মুংলীর ওপরে ওর যেন একটু ভালবাসাও আছে।

নাঃ, আর ভাবা যায় না। চোখ দুটো এবার জড়িয়ে আসছে। সিগারেটটা ফেলে নিভিয়ে দিয়ে এপাশ ফিরে শুল সুকান্ত। এবার নিশ্চয়ই ঘুম আসবে।

বিছানা থেকে জানলার বাইরের আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্না ভরা আকাশ। ফুর ফুর করে একটা মিষ্টি হাওয়াও আসছে জানলাটা দিয়ে। একটু যেন শীত শীত মনে হল সুকান্তর। এ জায়গাটা এরকমই। দিনেরবেলা রোদ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়ে। আর রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে শীত। চাদরটা গায়ে টেনে দিল সুকান্ত।

দূর থেকে মাদলের আওয়াজ এখনও ভেসে আসছে। ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্, ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্। চোখ দুটো বুঁজে আসছে সুকান্তর। কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল জানতে পারল না।

চার

খুব সকালেই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল স্থকান্তর। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। আকাশে ভোরের আলো। চাদরটাকে ভাল করে গায়ে টেনে দিল সে, তবুও শীত শীত ভাবটা গেল না। মনে মনে ভাবল স্থকান্ত, আহা, রামদীনটা যদি এই সময়ে বেশ গরম গরম এক কাপ চা নিয়ে আসত!

হঠাৎ দরজায় টক্ টক্ শব্দ হল। দরজার দিকে ফিরে তাকাল স্থকান্ত। তবে কি রামদীন তার মনের কথা শুনতে পেল? গায়ে চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে স্থকান্ত উঠে দরজাটা খুলে দিল। সামনে লখন সর্দার।

এই সময়ে সর্দারকে এখানে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল স্থকান্ত। স্থকান্তকে দেখে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করল সর্দার। চোখ দুটো তার লাল টক্‌টক্ করছে। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো। মনে হল, সারারাত ঘুমোয়নি। হয়ত সারারাত ধরেই নাচগান করেছে, আর মদ খেয়েছে।

—'একটু বিরক্ত করতে এলাম বাবুজি।' হেসে বলল সর্দার।

—'না না, বিরক্তর কি আছে? এস বস।' বলে স্থকান্ত সর্দারের দিকে একটা টুল এগিয়ে দিল। নিজে এসে বিছানাটার ওপরে বসল।

—'কাল সন্ধ্যাবেলা মুংলী আপনার এখানে এসেছিল বাবুজি?' টুলে বসতে বসতে প্রশ্ন করল সর্দার।

সর্দারের এ প্রশ্নের ঠিক মত অর্থ বুঝতে না পেরে স্থকান্ত তাকাল সর্দারের দিকে। তারপর ছোট্ট করে উত্তর দিল—'হ্যাঁ, এসেছিল।'

একটা কিছু যেন ভাবল সর্দার। তারপর একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'ঐ মুংলীটাকে নিয়েই হয়েছে যত ভাবনা! বুধনটা হারিয়ে যাবার পর থেকে ও যেন কেমন হয়ে গেছে! মুখে সে হাসি সেই, সে চঞ্চলতাও নেই। ওর বড় আশা ছিল, ঝুমরুটা একদিন বড় হবে, মানুষ হবে! বুধনই এইসব আশা ওকে দিত। ও মাঝে মাঝে গিয়ে সহরে কাজ করত কিনা, তাই সব সহরের গল্প সে মুংলীর কাছে বলত।'

—'কিন্তু ঝুমরুর বড় হবার সম্ভাবনা তো শেষ হয়ে যায়নি সর্দার!' বলল সুকান্ত—'নাই-বা রইল বুধন! কিন্তু তোমরা তো রয়েছ। তুমি রয়েছ, ওর মা রয়েছে। তোমাদের সহায়তা পেলে ও নিশ্চয়ই একদিন বড় হয়ে উঠবে।'

—'কিন্তু আমরা পাহাড়ি গেঁয়ো লোক বাবু, আমরা আর কতটুকু করতে পারি?' হতাশার স্বর সর্দারের কণ্ঠে।

বলল সুকান্ত—'জানি, তোমাদের জীবনে লেখাপড়া শিখে বড় হবার, মানুষ হবার সুযোগ আসেনি। কিন্তু এই যে আমাদের আজকের এই সব প্রচেষ্টা, এসব তো সেই সম্ভাবনাকে কাজে রূপ দেবার জন্যেই। ভেবে দেখ, এই বাঁধটাকে উপলক্ষ করে আমরা কত লোক এখানে এসে জড় হয়েছি। এই কাজটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কত লোক বাড়বে। তারপর যখন বিজলী তৈরী হবে, নানারকম কারখানা বসবে, তখন আসবে আরও লোক। তারপর একদিন এই জায়গাটা ঘিরে একটা সহর গড়ে উঠবে। স্কুল হবে, পাঠশালা হবে। সেইসব স্কুলে তোমাদের ছেলেমেয়েরা পড়বে। এমনি ভাবেই তো তোমাদের স্বপ্ন সফল হবে।'

চুপ করে শুনল কথাগুলি সর্দার। তারপর বলল—'আমিও

সারাটা রাত ভেবেছি এসব কথা। যোশীবাবুর কথাগুলো আমি মুংলীকেও বলেছি। মুংলীরও এতে সায় আছে। সেও চায়, বাঁধের কাজটা শেষ হয়ে যাক। এখানে কলকারখানা গড়ে উঠুক। স্কুল, পাঠশালা বসুক। আর সে স্কুল পাঠশালায় ঝুমরু তার লেখাপড়া শিখুক।' তারপর টুলটাকে আরও একটু কাছে নিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলল—'আর সেইজন্যেই ভাবলাম যে এই পাহাড় ফুটোর কাজে আমি তোমাদের সাহায্য করব।'

—'বেশ তো, খুব ভাল কথা!' খুশী হয়ে বলল সুকান্ত। 'আমরাও তো এই কথাই তোমাদের বোঝাতে চেয়েছিলাম। এসব তো আমাদের সকলের ভালর জন্যেই। সকলে মিলে হাত না লাগালে, এত বড় কাজটা সমাধা হবে কি করে?'

—'কিন্তু, বাবুজি—আমার লোকেরা যে এসব মানতে চায় না। ওরা বলে, এসব যা কিছু হচ্ছে, সব ঐ সহরের লোকেদের সুবিধার জন্য। আমরা শুধুই খেটে মরব।' সংশয়ের সুরে বলল সর্দার।

হাসল সুকান্ত। বলল—'এটা ওদের মস্ত ভুল! ওরা সব ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারছে না বলেই এরকম বলছে! কিন্তু এ ভুল ওদের ভাঙ্গাতে হবে সর্দার। আর সে দায়িত্ব তোমারই। তুমি হচ্ছ ওদের সর্দার। ওরা কখনও জীবনের আলো দেখেনি। তোমাকে সে আলো দেখাতে হবে সর্দার। ওদের অন্ধকার থেকে টেনে তুলতে হবে।'

এবার আরও একটু কাছে এগিয়ে এল সর্দার। তারপর একরকম ফিস্ ফিস্ করেই বলল—'ওরা কেউ কাজে না এলেও আমি একলাই আসব বাবুজি। আমার গায়ে এখনও অনেক

শক্তি। ওদের মত চার-পাঁচটা লোকের কাজ আমি একলাই করতে পারি। আমি শুধু চাই ঝুমরুটা বড় হোক, হয়ে মা'র দুঃখ ঘোচাক। আহা, মুংলী আমার বড় দুঃখী মেয়ে! এই বয়েসেই সে সব কিছু হারাল।' শেষের কথা ক'টা বলতে বলতে সর্দারের চোখ দুটো যেন ছল্ ছল্ করে উঠল।

সর্দারের পিঠ চাপড়ে বলল সুকান্ত—'তুমি কিচ্ছু ভেব না সর্দার। আমি দেখব, তোমার ঝুমরু যাতে লেখাপড়া শিখে বড় হয়। তোমরা শুধু আমাদের সঙ্গে কাজ করে যাও।'

—'আচ্ছা বাবুজি, আমি তাহলে এখন যাই।' বলে উঠে দাঁড়াল সর্দার। পা দুটো তার একটু টলে উঠল।

সুকান্তও উঠে দাঁড়াল! তারপর বলল—'তুমি তাহলে খানিক পরে ওখানে এস। আমি আমার লোকজন নিয়ে সময় মত যাবো।'

—'আসব' বলে চলে গেল সর্দার। সুকান্ত দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল ওর পেছন পেছন। তারপর দেখল, কোনও দিকে না তাকিয়ে সর্দার হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেল বাঁধটার ওপর দিয়ে।

ভাবল সুকান্ত। ঐ একফোঁটা ছেলেটার জন্য কি গভীর ভালবাসা সর্দারের। ওর ভালর জন্য, ওর ভবিষ্যতের জন্য নিজের এতদিনের এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও সে যেতে রাজি আছে। আশ্চর্য মানুষের মন!

পাঁচ

পাহাড় ফাটানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। লখন সর্দার এসেছে। কয়েকজন লোককেও সঙ্গে এনেছে, যারা সর্দারের ওপর আস্থা রাখে, যারা সর্দারকে বিশ্বাস করে। পয়সার লোভেও কয়েকজন এসেছে। ঘরে তাদের প্রচণ্ড অভাব। তাই তারা না এসে পারেনি।

ওরা কাজে আসে। নিয়মিত কাজ হয়। পাহাড়ের বুকে বারুদ ঠেসে দেয় সর্দার। তারপর আগুন ধরিয়ে দেয় তাতে। পাহাড় ফেটে ওঠে গুম্ গুম্ করে। বড় বড় পাথরের চাঁই ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ে নদীর বুকে। পড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। পাহাড়ের বুকে গাঁইতি শাবল চালায় শ্রমিকের দল। ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গটা এগিয়ে চলে পাহাড়ের বুকের ভেতর।

মুংলী মাঝে মাঝে পাহাড় ফাটান দেখতে আসে। সুকান্তকে সে দেখে মাঝে মাঝে।—বড় ভাল এই বাবুটি। মুখে সব সময়ে হাসি লেগেই আছে। আর কাজেও কি উৎসাহ! কি সুন্দর দেখতেও লোকটাকে। অনেকটা বুধনের মত মজবুত চেহারা। কিন্তু বুধনের মত অত কালো নয়!

—সুকান্তবাবু বলেছে, ঝুমরুর লেখাপড়ার ভার সে নেবে। ওঃ, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে মুংলীর! তার ঝুমরু সহরের লোকেদের মত একদিন বড় হবে, তারপর একদিন এসে তাকে 'মা' বলে জড়িয়ে ধরবে! উঃ, সে কথা কল্পনা করতেও গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে!

—ভাবতে থাকে মুংলী। কিন্তু যদি এই পাহাড়ে সত্যি সত্যিই দেবতা থাকে! যদি সত্যি সত্যিই দেবতা সবার ওপরে ক্রুদ্ধ হয়? যদি সত্যি সত্যিই সুড়ঙ্গের কাজটা একদিন বন্ধ হয়ে যায়! তবে? তবে কি থেমে যাবে এই সব প্রচেষ্টা? —হবে না কি তার স্বপ্ন পূরণ? তার ঝুমরু কি তাহলে একটা পাহাড়ি ছেলেই থেকে যাবে?

নাঃ, আর ভাবতে পারে না মুংলী। সব যেন কেমন ঘুলিয়ে যায়। এক সময়ে সে অশান্ত পায়ে পাহাড়টার ওপরে চলে যায়।

ঝুমরুও মাঝে মাঝে আসে মুংলীর সাথে। সে এত সব কিছু বোঝে না। এখানে ওখানে ছুটোছুটি করে বেড়ায় সে। মাঝে মাঝে দাদুর কাছেও যায়।—উঃ, কি ভীষণ একটা গর্ত করেছে দাদুটা ঐ পাহাড়টার মধ্যে! অন্ধকারে ভেতরটা কিছুই দেখা যায় না।

ঝুমরু দেখে, কি সব জিনিষ নিয়ে তার দাদুটা মাঝে মাঝে গর্তটার ভেতরে চলে যায়। তারপর বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে ওঠে 'সব হুঁশিয়ার। সবাই দূর যাও।' সকলেই দূরে সরে যায়। হঠাৎ আওয়াজ হয় 'গুম্ গুম্'। সমস্ত পাহাড়টা কেঁপে ওঠে। ভয় পেয়ে যায় ঝুমরু। একসময়ে কতগুলো লোক গর্তটার ভেতরে ঢুকে যায়। তারপর বের করে আনে বড় বড় পাথরের টুকরো। টুকরোগুলোকে তারা গড়িয়ে দেয় পাহাড়ের গা দিয়ে। মনে মনে ভাবে ঝুমরু, ঐ পাহাড়টা ফুটো হয়ে গেলে কি মজাই না হবে! ঐ ফুটো দিয়ে সে পাহাড়টার ওপারে চলে যাবে। তারপর দেখবে ওপারে কি আছে।

বাবার কথা মনে পড়ে না ঝুমরুর। তবে মার কাছে সে শুনেছে যে এই পাহাড়ের দেবতা নাকি তার বাবাকে পাহাড়ের এদিকটাতে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ভালই হবে! পাহাড়টা ফুটো হয়ে গেলে সে ওদিকটা ভাল করে খুঁজে দেখতে পারবে। একসময়ে সে মার পেছন পেছন চলে যায়।



ছয়

বর্ষা আসতে বোধহয় খুব বিশেষ দেরি নেই। মাঝে মাঝেই বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। নদীর বুকে জল চিক্ চিক্ করছে। জল এবার আর এগিয়ে যেতে পারছে না। বাঁধে আটকা পড়ে গেছে।

জোর কাজ চলছে পাহাড় ফাটানোর। ভরা বর্ষা নামবার আগেই সুড়ঙ্গের কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে।

এতদিন খুব উৎসাহের সঙ্গেই কাজ করেছে সর্দারের লোকেরা। ধীরে ধীরে আরও কিছু লোক এসে কাজে যোগ দিয়েছে। ওদের মনে বিশ্বাস জেগেছে যে, যা কিছু হচ্ছে সব তাদের ভালর জন্যেই। সর্দারও বুঝিয়েছে তাদের।

এর মধ্যে একদিন ঢল নেমেছিল। বিরাট দৈত্যের মত নদীটার বুকের ওপর দিয়ে জল ছুটে এসেছিল দূর পাহাড়গুলো থেকে। কিন্তু বাঁধটার মুখে এসে সে জল থমকে দাঁড়িয়েছিল। আর এগিয়ে যেতে পারেনি। ওরা আশ্চর্য হয়ে দেখেছিল, কি শক্তি এই বাঁধটার! দৈত্যের মত এই জলটাকেও সে রুখে দিল। তাদের ঘর-বাড়ি ক্ষেত কিছু ভেসে গেল না। নাঃ, সুদিন বোধহয় তাদের এবার সত্যিই ফিরে আসছে!

একদিন।

সুড়ঙ্গের বুকে আগুন দিয়ে বেরিয়ে এল সর্দার। রোজকার মতই সে চিৎকার করে উঠল—'হুঁশিয়ার, সবাই দূর যাও।'

সবাই একটু দূরে সরে গেল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল কখন বিস্ফোরণ ঘটবে। খুব বড় একটা বিস্ফোরণের জন্যেই আজ অনেক বেশী করে বারুদ ঠেসেছে সর্দার।

হঠাৎ কয়েকজনের নজর গেল পাহাড়টার ওপরে। চমকে

উঠল সবাই। কি করছে মুংলী এই সময়ে ওখানে! পাহাড়ের ঐখানটাতেই তো সেই বিরাট খাদ্‌টা সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। এদিকে যে বারুদে আগুন লাগান হয়েছে!

একজন চিৎকার করে উঠল—'এই মুংলী, ওখানে কি করছিস? শিগ্‌গির নেমে আয়।'

মুংলীর কানে বোধহয় কথাগুলো গেল না। কিংবা গেলেও হয়তো সে কথাগুলো খেয়াল করল না। আপন মনে সে আরও ওপরে উঠতে লাগল।

সবাই হৈ হৈ করে উঠল—'এই মুংলী, শিগ্‌গির নেমে আয়। বারুদে আগুন লাগান হয়েছে।'

ওদের সঙ্গে সর্দারও চেঁচিয়ে উঠল—'এ বিটিয়া জল্‌দি নেমে আয়।—এ মুংলী—'

কিন্তু মুংলীর কানে সে ডাক পোঁছবার আগেই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটল—গুম্‌ গুম্‌। থর থর করে কেঁপে উঠল সমস্ত পাহাড়খানা। ধোঁয়ায় ভরে গেল সুড়ঙ্গের মুখ।

সবাই স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন ধোঁয়াটা কেটে যাবে। কখন তাদের দৃষ্টিপথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। কখন তারা দেখতে পাবে পাহাড়ের ঐখানটা, যেখানে গিয়ে মুংলী উঠেছিল।

ধোঁয়া একসময়ে কেটে গেল। দৃষ্টিপথ পরিষ্কার হল। কিন্তু কোথায় মুংলী? ঐ জায়গাটা তো খালি!

ভয় পেয়ে গেল সবাই। তবে কি মুংলীকে দেবতা নিয়ে নিল?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সর্দার। 'আমার মুংলী চলে গেল বাবু। দেবতা তাকে নিয়ে নিল। আমরা দেবতার বুক ফুটো করেছি। দেবতা তার শোধ নিল।'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুকান্ত। দেখল, সর্দার একটা

ছোট শিশুর মত কাঁদছে। দু গাল বেয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছে অঝোর ধারায়।

সুকান্ত এগিয়ে এসে সর্দারের কাঁধে একটা হাত রাখল, তারপর সান্ত্বনার সুরে বলল, 'কেঁদ না সর্দার। কাঁদলে তো আর মুংলী ফিরে আসবে না। তাছাড়া মুংলী হয়তো মরেনি! হয়ত খাদের ওপাশে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে। আমরা লোকজন পাঠিয়ে এখুনি দেখছি।'

জলভরা চোখ তুলে তাকাল সর্দার সুকান্তর দিকে।—'না না বাবু, ও চলে গেছে। ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেবতা যাকে একবার নেয়, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বুধনকেও পাওয়া যায়নি।' তারপর একটু থেমে বলল—'কাল রাত্রে আমি এমনিই এক স্বপ্ন দেখেছিলাম বাবু। মনে হল, মুংলী কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আমি আর তাকে খুঁজে পেলাম না।'

'কিন্তু ওখানে ও কি করছিল? ও কি জানতো না যে এ সময়ে পাহাড় ফাটানোর কাজ চলছে?' বলল সুকান্ত।

'সব জানত বাবুজি।' চোখ দুটোকে একটু মুছে নিয়ে বলল সর্দার। 'কিন্তু ও আমার কথা শুনত না। বলত, বুধনকে সে খুঁজে বার করবেই। তাই সময় পেলেই ছুটে চলে আসত এ পাহাড়টায়।'

—'কিন্তু ওর খাদের অত কিনারে মোটেই যাওয়া উচিত হয়নি।' এগিয়ে এসে বললেন মিঃ যোশী। 'আমার বিশ্বাস, হঠাৎ আওয়াজে ভয় পেয়ে ও নিশ্চয়ই খাদের মধ্যে পড়ে গেছে। আমরা এখুনি লোক পাঠিয়ে দেখছি। ওর দেহটা আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।'

মুংলীর কথাটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দলে দলে লোক আসতে লাগল। নানা জনে নানা মত প্রকাশ করল। বেশীর ভাগ লোকই বিশ্বাস করল, এ দেবতার ক্রোধ। দেবতার বুক ফাটান দেবতা সহ্য করেনি।

সেদিন আর কোনও কাজ হল না। একসময়ে সবাই ঘরে ফিরে গেল।

ফিরে গেল লখন সর্দারও। মুংলী তার চলে গেল। দেবতা মুংলীকে নিয়ে নিল। দেবতার নিশ্চয়ই ক্রোধ হয়েছে। দেবতাকে অমান্য করেছে সর্দার। দেবতার বুক থেকে সে খুদে খুদে পাথরের চাঁই বের করেছে। সুড়ঙ্গটা এতখানি সে-ই এগিয়ে নিয়ে গেছে। আর বোধহয় দু'একদিন কাজ করলেই পাহাড়টা ফুটো হয়ে যেত। দেখা যেত ওদিকের আকাশ। দেবতা এতদিন সহ্য করেছিল। দেখছিল, নির্বোধ মানুষগুলো কতদূর এগুতে পারে। তারপর শেষ সময়ে দেখিয়ে দিল তার প্রতাপ। দেখিয়ে দিল তার শক্তির কাছে মানুষের শক্তি কত তুচ্ছ! এক মুহূর্তেই সে নিয়ে নিল মুংলীকে। মুংলীকে নিয়ে সে সর্দারকে শিক্ষা দিয়ে গেল। নিজের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে কথাগুলো ভাবছিল সর্দার।

কিন্তু দেবতা মুংলীকে না নিয়ে অন্য কারুকেও তো নিতে পারত? কিন্তু না, দেবতা ঠিকই করেছে। সর্দারই তো এগিয়ে এসে এই সুড়ঙ্গের কাজে হাত দিয়েছিল। সর্দারের মনে মনে ইচ্ছা ছিল, এই বাঁধের কাজ শেষ হলে এখানে একদিন একটা সহর গড়ে উঠবে, সে সহরে ইস্কুল বসবে, আর সে ইস্কুলে ঝুমরু পড়বে। নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই সে দেবতাকে উপেক্ষা করেছিল। দেবতা সে কথা বুঝতে

পেরেছিল। তাই মুংলীকে নিয়ে দেবতা তাকে শাস্তি দিল। ভাবতে ভাবতে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল সর্দার।

সামনের একটা গাছের নিচে ঝুমরু নিজের হাঁটু দুটোর ওপরে মুখটা রেখে বসেছিল। সামনে ওর প্রিয় ছাগলছানাটা লাফালাফি করছিল। ও সেদিকে দেখছিল না। ও ভাবছিল ওর মার কথা। সবাই বুঝিয়েছিল তাকে, তোর মা অনেক দূরে এক জায়গায় চলে গেছে। আবার আসবে অনেকদিন পরে। কিন্তু ওর ছোট্ট মন বুঝেছিল, তার মা এমন এক জায়গায় চলে গেছে যেখান থেকে সে আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। যদি ফিরেই আসত, তবে তার দাদু এমন মনমরা হয়ে বসে থাকত না।

তাকাল সে দাদুর দিকে। দেখল চুপচাপ বসে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দাদু যেন কি ভাবছে। ধীরে ধীরে উঠে এল সে। তারপর দাদুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর দাদুর গালে একটু হাত বুলিয়ে বলল, 'আজ আর কাজ হবে না দাদু ?'

'না, একাজ আর হবে না।' বলে সর্দার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল ঝুমরুকে। আবেগভরে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তোর দরকার নেই দাদু লেখাপড়া শিখে। তোর দরকার নেই বড় হয়ে। তুই একটা জংলী পাহাড়ী ছেলে হয়েই বেঁচে থাক। দেবতার ক্রোধ যেন তোর ওপর না পড়ে।' বলে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল সর্দার।

চুপ করে পড়ে রইল ঝুমরু দাদুর বুকের ভেতর। কিছুক্ষণ সে কথা বলল না। তার ছোট মন বুঝতে পেরেছিল, দাদুর ভীষণ কষ্ট হয়েছে। নইলে দাদু এরকম কখনও করে না।

ধীরে ধীরে সূর্য আকাশের মাঝখানে গিয়ে উঠল।

সাত

ভারি মন নিয়ে সুকান্তও ফিরে এসেছিল তার অফিসে। এসে চুপচাপ বসেছিল অনেকক্ষণ। বারেবারেই মুংলীর মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সবাই বলাবলি করছিল নিজের দোষেই মেয়েটা অমন ভাবে মারা গেল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিসের কিছু কাজে মন বসাতে চেষ্টা করেছিল সুকান্ত। কিন্তু পারেনি, মুংলীর চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছিল না। অদ্ভুত সহজ আর সরল ছিল মেয়েটা। ভয় ছিল না একটুও। একটা যেন বুনো পাখী আপন খুশীমত আকাশের গায়ে ভেসে বেড়াত কোনও কিছুর খেয়াল না করে।

বেশীক্ষণ ভাবতে পারল না সুকান্ত। একটু পরে রামদিন এসে হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

চিঠিটা একবার উল্টেপাল্টে দেখল সুকান্ত। কলকাতার চিঠি। ললিতার তাহলে এতদিনে চিঠি লেখবার সময় হল! একটু উৎফুল্ল হয়ে চিঠিটা খুলল সুকান্ত।

কিন্তু না, এ তো ললিতার চিঠি নয়। এ তো মার চিঠি। মা লিখেছে—'হঠাৎ ললিতার অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। ডাঃ সেনই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেখানে ললিতার একটা ছেলেও হয়েছিল। কিন্তু অনেক করেও ছেলেটিকে বাঁচান গেল না। অবশ্যি ললিতার বিপদের আশঙ্কা এখন কেটে গেছে। তবে খুব দুর্বল। সুকান্ত যদি সময় করে একবার দেখে যেতে পারে তবে খুব ভাল হয়। সুকান্তর জন্য ললিতা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।'

চিঠিটা পড়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সুকান্ত। হয়ত সে থাকলে ছেলেটা এভাবে মারা যেত না। ললিতাকে আরও বড় কোনও ডাক্তারকে সে দেখাতে পারত। ভাবল সুকান্ত—তবে কি এই দেবতার অভিশাপ তার ওপরেও গিয়ে পড়ল? তাই কি তিনি কেড়ে নিলেন তার প্রথম সন্তানটিকে?

সুকান্তকে চুপ চাপ ভাবতে দেখে মিঃ যোশী এগিয়ে এলেন। মিঃ যোশীকে দেখে সুকান্ত চিঠিটা মিঃ যোশীর দিকে এগিয়ে দিল। চিঠিটা পড়লেন মিঃ যোশী। বাংলা তিনি জানতেন। পড়ে তিনি তাকালেন সুকান্তর দিকে। বললেন, 'যান না, ঘুরে আসুন না কয়েকদিন কলকাতা থেকে। এ সময় আপনার যাওয়াটা প্রয়োজন।'

—'হ্যাঁ, কয়েকদিনের জন্য ঘুরে আসতে পারলে খুব ভাল হতো।' উদাস কণ্ঠে বলল সুকান্ত।

—'আপনি তাহলে আজ রাতের গাড়িতেই চলে যান। এদিকের কাজগুলো আমি সব ব্যবস্থা করে নেব'খন। সুড়ঙ্গের কাজটা আপাততঃ কয়েকদিন বন্ধ থাক। সর্দারের লোকেরা একটু শান্ত হোক।' বললেন মিঃ যোশী। মিঃ যোশীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুকান্ত ফিরে এল নিজের কোয়াটারে। রামদিনই সব গুছিয়ে-ঠুছিয়ে দিল। তারপর একটা জীপে করে বেরিয়ে পড়ল সে স্টেশনের উদ্দেশ্যে। মনে হল, অনেকদিন পরে সে যেন কলকাতায় ফিরে চলেছে।

আট

কলকাতা পৌঁছে সোজা হাসপাতালে গিয়েই উঠল সুকান্ত। সুকান্তকে দেখে ললিতার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সান্ত্বনা দিল সুকান্ত। 'যে চলে গেছে, তার জন্যে আর কেঁদ না ললিতা। আমরা আরও বাঁচব, আরও পাব। শুধু তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ।'

ডাঃ সেনের সঙ্গেও দেখা করল সুকান্ত। ডাঃ সেন দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'আমরা খুব চেষ্টা করেছিলাম ছেলেটিকে বাঁচাতে, কিন্তু পারলাম না।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আরেকটাও দুঃখের সংবাদ দেব আপনাকে।'

মুখ তুলে সুকান্ত তাকাল।

ডাঃ সেন বললেন, 'রুগীর অবস্থা খুব খারাপ হওয়াতে আমরা 'অপারেশন' করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এতে রুগীর জান বাঁচল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ওর সন্তান হবার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল। অবশ্যি এ কথাটা ওঁকে এখনও জানান হয়নি।'

চুপচাপ কথাগুলো শুনল সুকান্ত। তারপর ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এল।

কয়েকদিন পরে একটু সুস্থ হলে ললিতাকে বাড়িতে নিয়ে এল সুকান্ত। কয়েকদিন চুপচাপ থাকল ললিতা, তারপর বায়না ধরল সে সুকান্তর সঙ্গে যাবে, এখানে একলা আর কিছুতেই পড়ে থাকতে পারবে না।

সুকান্ত বোঝাল, ওটা হল জঙ্গল আর পাহাড়ের দেশ, ওখানে সহরের কোনও সুখ সুবিধাই নেই, তবুও ললিতা বুঝল না। তার ঐ এক কথা, কলকাতা আর ভাল লাগছে না।

মার কথা তুলেও সুকান্ত আপত্তি জানিয়েছিল। বুড়ো মা

একলা কি করে থাকবেন ? কিন্তু মা-ও ললিতার প্রস্তাবে সায় দিলেন। বললেন, 'যাক না, ঘুরে আসুক বৌমা তোর সঙ্গে কিছুদিন। হাওয়া বদলালে শরীরটাও সারবে, আর তোর কাছে থাকলে মনটাও ভাল থাকবে।'

'কিন্তু তুমি একলা থাকবে মা ?'—আপত্তি জানাল সুকান্ত।

'একলা কেন ? মুকুন্দ তো রইলই।' হেসে জবাব দিলেন মা। 'ওই সব দেখাশুনো করবে। আর আমার জন্যে দুটো চাল ? সে আমি নিজেই ফুটিয়ে নিতে পারব।'

শেষ পর্যন্ত ললিতার যাওয়াই ঠিক হল। দু'একদিন ঘুরে কিছু দরকারি জিনিষপত্র কেনাকাটা করে নিল ওরা। তারপর একদিন রেলগাড়িতে চেপে বসল।

এখানে এসে চারদিকের খোলামেলা পরিস্থিতি দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ললিতা। মনে হল, সে যেন একটা নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছে।

কী বিরাট পাহাড় ! কী বিরাট বাঁধ ! বনে বনে ফুলের কী বিরাট সমারোহ ! ছোট্ট শিশুর মত যেন চঞ্চল হয়ে উঠল ললিতা।

সহরের সে ধোঁয়া ধুলো নেই, দম-আটকানো পরিবেশ নেই। মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচল যেন সে।

নতুন উদ্যমে সে লেগে গেল নতুন সংসারের কাজে। দু'দিনের মধ্যেই সে সুকান্তর ঘরটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তক্‌তকে করে ফেলল। রামদিন দেখে বলল, 'বাবুর ঘরে এবার লছমী এল।' ওর আরও আনন্দ, ওকে আর তাড়াহুড়ো করে সুকান্তবাবুর জন্য রান্না করতে হবে না। আর মাইজির কাছে কলকাতার নানা গল্প শুনতে পাবে। আর সেই সঙ্গে মাইজির হাতের দু'একটা ভালমন্দ রান্নাও জুটে যাবে।

নয়

পাহাড় ফাটানর কাজ এ ক'দিন বন্ধই রেখেছিলেন মিঃ যোশী। মুংলীর ব্যাপারটা নিয়ে এদের মধ্যে বেশ একটা গোলমাল সুরু হয়ে গিয়েছিল। অনেক খুঁজেও মুংলীর দেহটা পাওয়া যায়নি।

সুকান্ত আসতে মিঃ যোশী এ ক'দিনের কাজকর্মের সব কথা বললেন। তারপর পাহাড় ফাটানর কথা তুললেন। বললেন, কাজটা এবার শেষ করে ফেলতে হবে। বর্ষা নামতে সুরু হয়েছে।

সুকান্ত বলল—'আগে সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা করে নিই—তারপর কি ভাবে কাজটা সুরু করা যায় ভেবে দেখব।'

পরদিন জীপগাড়ি নিয়ে সুকান্ত বেরিয়ে পড়ল সর্দারের কুঁড়ের উদ্দেশ্যে। ললিতাও সঙ্গ নিল। ওর এ সব খুব ভাল লাগে। মনে মনে ভাবে ললিতা—এই যে চারদিকে এত বড় বড় সব কাজ হচ্ছে,' এতে যদি সে কিছুমাত্র অংশ গ্রহণ করতে পারত! এক সময়ে সুকান্তকে সে একটা কাজের কথাও বলেছিল। বলেছিল—ম্যাট্রিক পাশ তো সে করেছেই। অফিসের একটা ছোটখাট কাজ তো সে করতে পারেই।

উত্তরে সুকান্ত হেসে বলছিল—'এই যে আমার জন্যে দুবেলা দুটো রান্না করে দিচ্ছ, এতবড় একটা কাজের উৎসাহ জোগাচ্ছ, সেটাও কি খুব বড় কাজ হল না!' কিন্তু এ উত্তরে ললিতার মন ভরেনি।

জীপ এসে থামল বাঁধটার শেষে পাহাড়টার গায়ে। জীপ থেকে নামল সুকান্ত আর ললিতা। তারপর ঢালু

পাহাড়ের গা বেয়ে একটু নিচের দিকে নেমে গেল তারা। কয়েকজন অধিবাসী ওদের দেখতে পেয়ে সর্দারকে গিয়ে খবর দিল। ওরা এসে দাঁড়াল সর্দারের কুঁড়ের সামনে।

ওদের দেখে সর্দার বেরিয়ে এল। ঝুমরুও এল পেছন পেছন, সর্দার তাকাল ললিতার দিকে। সুকান্ত সর্দারের সঙ্গে ললিতার পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল সর্দারের কুশল। মুংলীর জন্য দুঃখও প্রকাশ করল।

সর্দারের গা ঘেঁষে ঝুমরু চুপচাপ দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ করে দেখছিল ললিতাকে। এমন সুন্দর জামা কাপড় পরা মেয়েছেলে সে দেখেনি। কি সুন্দর ফরসা রঙ। এরকম রঙ এখানকার কোনও মেয়েছেলের নেই।

ঝুমরুকে ওরকম ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ললিতা এগিয়ে গিয়ে ঝুমরুকে কাছে টেনে নিল। সুকান্তর কাছে ললিতা শুনেছে মুংলী আর ঝুমরুর কথা। শুনেছে, কি ভাবে একদিন পাহাড়টার ওপাশের খাদে পড়ে গিয়ে মুংলী মারা গিয়েছিল। ঝুমরুর সঙ্গে ভাব করবার জন্য ললিতা নিজের ব্যাগটা খুলে কলকাতা থেকে আনা কতগুলো রঙিন কাগজে মোড়া চকোলেট ওর হাতে তুলে দিল।

বড় বড় চোখ করে ঝুমরু সেগুলো দেখতে লাগল। তারপর কাগজের মোড়ক খুলে একটা চকোলেট মুখে পুরে দিল। তারপর মিষ্টি হেসে তাকাল ললিতার দিকে।

ললিতা বুঝল, ওর সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে। হেসে বলল—'আরও চাই ?'

চকোলেটটা চিবুতে চিবুতে ঝুমরু শুধু মাথা নাড়ল। মানে আরও চাই।

ললিতা ব্যাগ খুলে আরও চকোলেট বের করতে যাচ্ছিল। ঝুমরু হাত তুলে বলল, 'দাঁড়াও'। তারপর হঠাৎ লাফাতে লাফাতে ওর ছাগলছানাটা যেখানে খেলা করছিল, সেখানে ছুটে গেল।



চারদিক একবার দেখে নিল ললিতা। বড় ভাল লাগছিল তার এই সুন্দর কুঁড়েগুলি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কেমন

সারিসারি সাজান! মাঝে মাঝে কি সুন্দর এক এক ফালি ক্ষেত। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়, ছোট বড় গাছে ভরা। তাতে কতরকম ফুল ফুটে রয়েছে।

হঠাৎ একটু দূরে নজর পড়ল ঝুমরুকে। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সে ইসারা করে ললিতাকে ডাকছে। কোলে তার ছাগলছানাটা। ললিতা ওর দিকে চেয়ে হাসল তারপর সুকান্তকে বলল—'তোমরা কথা বল—আমি ওদিক থেকে একটু আসছি।' বলে চলে গেল সে ঝুমরুর দিকে। ঝুমরু ললিতাকে এগিয়ে আসতে দেখে লাফিয়ে লাফিয়ে আরও দূরে চলে গেল। ললিতাও প্রায় দৌড়ে গিয়েই তাকে ধরে ফেলল।

পাহাড় ফাটানর কথা তুলল সুকান্ত। বলল—'সবাই মিলে কাজটাকে শেষ করে দাও সর্দার। জানি, তোমার অনেক ক্ষতি হয়েছে। তোমার বুধন গেছে, মুংলী গেছে। কিন্তু এই এত বড় কাজের পেছনে সবার জন্যে যে কত মঙ্গল রয়েছে তা তুমি একবার ভেবে দেখ সর্দার। তোমাদের কয়েকটা লোকের জীবনদানে যদি ভবিষ্যতের শত সহস্র লোকের মঙ্গল হয়, তবে কি তুমি পিছিয়ে থাকবে সর্দার?'

কি যেন ভাবতে লাগল সর্দার। মনে হল, তার দৃষ্টি যেন চলে গেছে অনেক দূরে, ঐ পাহাড়টার চূড়া ছাড়িয়ে আকাশের গায়ে, যেখানে ছোট ছোট অনেকগুলো সাদা-কাল মেঘের টুকরো একসঙ্গে খেলা করছিল। আর সেই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একটা সাদা পাখা তার পাখা দুটো মেলে দিয়ে হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল। এক একবার মেঘের বুকে ঢেকে যাচ্ছিল তার দেহটা। পাখীটাকে দেখে সর্দারের বোধহয় মুংলীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।—এমনি ভাবেই মুংলী তার

ঘুরে বেড়াত পাহাড়ের কোলে। ফোঁস্ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সর্দার।

সুকান্ত বুঝল, সর্দারের মনে একটা সংশয়ের দোলা চলেছে। তাকে একাজে রাজী করাতেই হবে। সুকান্ত আবার বলে চলল—'ভেবে দেখ সর্দার, এই সেদিন ললিতার একটা ছেলে হয়েছিল। প্রথম সন্তান। কিন্তু ছেলেটিকে বাঁচান গেল না। কোথায়, সে দুঃখে তো আমি মুষড়ে পড়িনি? সব কিছু ফেলে আমি তো আবার কাজেই ছুটে এসেছি। কাজই তো মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কর্তব্যের বড় আর কিছু জিনিষ আছে নাকি?'

আকাশের বুক থেকে চোখ নামিয়ে আনল সর্দার। তারপর তাকাল সুকান্তর দিকে। চোখ দুটো তার কেমন যেন করুণ। মনে হল, অনেক কান্না বুঝি ওখানে লুকিয়ে রয়েছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল সর্দার,—'সবই বুঝি বাবু। আমার আর কি। বয়স তো হল। মরবার ভয় আমি করি না। দেবতার ক্রোধে আমার যদি মৃত্যুও হয় তবুও আমি ডরাই না। আমার শুধু ভাবনা ঐ ঝুমরুটাকে নিয়ে। মুংলীর বড় আশা ছিল ও একদিন বড় হয়ে মুংলীর দুঃখ ঘোচাবে। কিন্তু অদৃষ্টে তার কিছুই হল না। চলে গেল সে।' বলে চোখ দুটো একটু মুছে নিল সর্দার কাপড়টার খুঁট দিয়ে।

বলল সুকান্ত—'ঝুমরুর ভবিষ্যৎ তো এখনও শেষ হয়ে যায়নি সর্দার। হয়ত তোমার মুংলী কিছু দেখে যেতে পারল না। কিন্তু ভবিষ্যতে শত শত মুংলী দেখবে তাদের শত শত ঝুমরুর উজ্জ্বল জীবন। আর সেই সম্ভাবনাকে সফল করতে

হলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সর্দার। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না।'

'ঠিক আছে!' একটা গভীর প্রত্যয়ের নিঃশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল সর্দার। 'তোমার এ কাজ আমি শেষ করে দেব বাবু। আর যদি কেউ এগিয়ে না আসে, তবে আমি একলাই যাব। আমি এখনও একলা দশজনের কাজ করতে পারি।'

'সাবাস্ সর্দার।' সুকান্ত সর্দারের হাত দুটো চেপে ধরল। তারপর বলল—'দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে সর্দার। আমাদের ভালমন্দ এখন আমাদেরই বুঝতে হবে। অন্ধকার আর কুসংস্কারের মধ্যে পড়ে থাকলে আর চলবে না। সব ভয়, সব ডর কাটিয়ে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। তবেই না আমরা দেখবো আলো, তবেই না আমাদের জীবন থেকে সব সংশয়ের মেঘ কেটে যাবে।'

কথার মাঝে ঝুমরু আর ললিতা এসে দাঁড়াল। দুজনেই খুশী, দুজনেই উচ্ছ্বসিত। একগুচ্ছ লাল ফুল ললিতার হাতে। ললিতা হেসে সুকান্তকে বলল—'চকোলেটের বদলে ঝুমরু আমাকে এগুলো উপহার দিয়েছে।'

সর্দার আর সুকান্ত তাকাল ওদের দিকে। সর্দার দেখল, ঝুমরু যেন মুংলীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুংলীর মুখে মিষ্টি হাসি। ছেলের হাত ধরে গর্বে যেন সে ফেটে পড়ছে। আর সুকান্ত দেখল, তার সেদিনের সেই জন্মান ছেলেটা হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেছে। মার হাত ধরে সে দুষ্টুমিভরা চোখ নিয়ে মার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

হঠাৎ প্রশ্ন করল সর্দার—'কবে থেকে তোমরা কাজ সুরু করবে বাবুজি ?'

উৎসাহ পেল সুকান্ত। বলল—'তুমি যদি চাও তবে কাল থেকেই সুরু করতে পারি। কেননা দু'একদিনের মধ্যেই বোধহয় জোর বর্ষা নেমে যাবে। তখন কাজ করা খুব অসুবিধা হবে। অবশ্যি কাজও বোধহয় আর দু'একদিনেরই আছে। এটুকু কাজ অন্য কারুকে দিয়েও করিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু তোমার হাত দিয়েই সুরু হয়েছিল এ কাজ। তাই তোমার হাত দিয়েই শেষ করতে চাই। তুমি হলে এখানকার সর্দার।'

'ঠিক আছে। কাল সব তৈরী করে রেখ। কাল আমি যাব।' একটু শক্ত হয়েই কথাগুলো বলল সর্দার।

সর্দারের হাত দুটো চেপে ধরল সুকান্ত। তারপর বলল, 'দেবতা নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল করবেন সর্দার। তোমার এত বড় ত্যাগের কথা কেউ ভুলবে না। কালকে তাহলে এসো কিন্তু।' বলে বিদায় জানাল সুকান্ত।

ঝুমরু কিন্তু ললিতার আঁচল ছাড়ল না। বড় ভাল লেগে গেছে তার এই নতুন মানুষটিকে। কি মিষ্টি করে কথা বলে। আর কি সব নানা রঙের মিষ্টি খেতে দেয়ে!

ঝুমরুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ললিতা, 'আমি আবার আসব। আবার তোমার জন্য চকোলেট নিয়ে আসব।'

'ঠিক তো'—বড় বড় চোখ করে বলল ঝুমরু।

'ঠিক'—হেসে বলল ললিতা। 'তুমিও একদিন এস না তোমার দাদুকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে। দেখবে, আমার কাছে কত সুন্দর সুন্দর খেলনা আছে। তোমাকে সব দেব।'

ছুটে গেল ঝুমরু দাদুর কাছে। দাদুর গলাটা জড়িয়ে

বলল—'যাবে দাদু ওদের বাড়িতে একদিন? কত খেলনা আছে ওখানে।'

'যাব'—ঝুমরুকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে বলল সর্দার।

'আচ্ছা সর্দার, কাল আবার দেখা হবে।' বলে সুকান্ত আর ললিতা চলে গেল। ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। ওদের যাবার পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সর্দার আর ঝুমরু। ঝুমরুর হাতে তখনও ছিল ললিতার দেওয়া দুটো চকোলেট। ঝুমরু কাগজের মোড়ক দুটো খুলে একটা নিজের মুখে পুরে দিল। তারপর আরেকটা এগিয়ে ধরল দাদুর মুখের কাছে।

ঝুমরুর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে একটু হাঁ করল সর্দার। ঝুমরু হেসে চকোলেটটাকে সর্দারের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। মুখটাকে বন্ধ করে সর্দার একটু হাসল ঝুমরুর দিকে চেয়ে। সুকান্ত আর ললিতা ততক্ষণে জীপগাড়িতে গিয়ে বসেছে। দূর থেকে দেখল ওরা, জীপগাড়িটা একরাশ ধুলো উড়িয়ে বাঁধটার ওপর দিয়ে চলে গেল।

দশ

পরদিন।

সকাল থেকেই আকাশটা কালো হয়ে রয়েছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। রাতে বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাঁধের মুখে জল অনেকখানি উঁচু হয়ে গেছে। অবশ্যি বাঁধের ওপর দিয়ে জল উপছে পড়তে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। তার আগেই সুড়ঙ্গের কাজটা শেষ হয়ে গেলে খুব ভাল হয়।

গতকাল সর্দারের ওখান থেকে ফিরে গিয়ে সুকান্ত সব ঠিকঠাক করে রেখেছিল। সর্দার কাজ সুরু করতে রাজী হয়েছে শুনে মিঃ যোশীও খুব খুশী হয়েছিলেন। তিনিও সব জোগাড়যন্ত্র করে রাখলেন যাতে কাজটা ঠিকমতনই শেষ হয়ে যায়।

সর্দার কথা রেখেছে। কাজে এসেছে সে। সঙ্গে এনেছে চার জন বিশ্বস্ত লোক। এরা সর্দারের ভীষণ ভক্ত। সর্দারের আদেশ এরা অন্ধের মত পালন করে।

সর্দারের এই মত পরিবর্তনে আশ্চর্য হয়েছে অনেকেই, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহস করেনি। সবাই দেখেছে, সর্দার যেন আজ অন্য মানুষ। মুখখানা তার ভীষণ কঠিন।

সুকান্তর সঙ্গে ললিতাও এসেছে পাহাড় ফাটান দেখতে। পাহাড় ফাটান সে কখনও দেখেনি। শুনেছে, এ নাকি এক বিরাট ব্যাপার। 'ডিনামাইটে' আগুন লেগে পাহাড় যখন ফাটে তখন নাকি বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো সামান্য ঢিলের মত আকাশে উড়ে যায়!

লোকজন আরও এসেছে অনেক। সবারই খুব উৎসাহ। যাক, কাজটা তাহলে এবার শেষ হবে।

সুড়ঙ্গর ভেতরটা একবার ঘুরে এল সুকান্ত। কালকে রাত্রের বৃষ্টিতে সারা পাহাড়টা ভিজে গেছে। সুড়ঙ্গর ভেতরটাও ভিজে সপ্‌ সপ্‌ করছে। ভেতরের অনেক জায়গা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে শীর্ণ ধারায়। কোন্ কোন্ জায়গায় 'ডিনামাইট' রাখলে সুড়ঙ্গটা ঠিকমত ফাটবে, বারুদ ভিজে যাবে না, এরকম দুটো জায়গা চিহ্নিত করে বাইরে বেরিয়ে এল সুকান্ত।

সুড়ঙ্গর মুখে অপেক্ষা করছিল সর্দার। সুকান্ত আসবার আগে সেও একবার ভেতরটা ঘুরে দেখে এসেছে। সুকান্তকে দেখে সর্দার বলল—'তাহলে কাজ সুরু করে দাও বাবুজি। আকাশের যে রকম অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে বৃষ্টি শিগ্‌গিরই নামবে।'

'হ্যাঁ, আমি দুটো জায়গা ঠিক করে এলাম।' উত্তর দিল সুকান্ত। 'সাবধানে ওখানে বারুদ ঢালতে হবে। আমার আন্দাজ যদি ঠিক হয়, তবে মনে হয় এতেই কাজ হয়ে যাবে। চল।'

সুকান্ত আর সর্দার সুড়ঙ্গর ভেতরে গেল। পেছন পেছন কয়েকজন লোক গেল গাঁইতি, শাবল আর লণ্ঠন নিয়ে। সুকান্তর হাতে জোরাল টর্চের আলোতে সমস্ত সুড়ঙ্গটাকে একবার ভাল করে দেখে নিল সর্দার।

মিঃ যোশীও এসে গেছেন এর মধ্যে। তিনিও সকলকে উৎসাহ যোগাচ্ছেন। বাঁধে যে ভাবে জল বাড়তে আরম্ভ করেছে, তাতে বাড়তি জলকে পাহাড়ের ওপারে নিয়ে গিয়ে না ফেলতে পারলে কাজের বিশেষ ক্ষতি হবে। ঘুরে ফিরে সবাইকে নানা নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি।

মিঃ যোশীরও আলাপ হয়েছে ললিতার সঙ্গে। এই সুন্দর

চট্‌পটে মহিলাটিকে খুব ভাল লেগেছে মিঃ যোশীর। সব কাজেই যেন মহিলাটির উৎসাহ প্রচুর। মিঃ যোশী দেখলেন, ললিতাও খুব উৎসাহের সঙ্গে এদিকে ওদিকে ঘোরা ফেরা করছে।

—ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। সুড়ঙ্গর ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে। গাঁইতি, শাবল, ছেনি দিয়ে গর্ত করছে ওরা। ছুটো গর্ত করতে কতই বা আর সময় লাগবে! তারপর বারুদ পুরে দেবে সে গর্তে। তারপর লাগাবে আগুন। দুম্ দুম্ করে পাহাড় ফাটবে। হয়ত এই ফাটানতেই পাহাড় ফুটো হয়ে যাবে। আর যদি না হয়, তবে আবার গর্ত করতে হবে পাহাড়টার গায়ে।

সর্দারের সঙ্গে ঝুমরুও এসেছে পাহাড় ফাটান দেখতে। মা হারিয়ে যাবার পর থেকে সে এখন সব সময়েই দাদুর পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। ওরও কেমন যেন ভয় হয়ে গেছে! হয়ত মার মত দাদুও একদিন পাহাড়ের কোলে নিখোঁজ হয়ে যাবে।

ললিতাকে দেখতে পেয়ে ঝুমরু লাফাতে লাফাতে কাছে এগিয়ে এল। এসে আঁচলটা টেনে ধরল ললিতার। আঁচলে টান পড়তে ফিরে তাকাল ললিতা। ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল ঝুমরু। ললিতা আদর করে ওকে কোলে তুলে নিল।

কোলে উঠে বড় বড় চোখ করে বলল ঝুমরু, 'জান, কাল আমার দাদু কি বলছিল?'

'কি?'—উৎসাহভরে প্রশ্ন করল ললিতা।

'বলছিল, তুমি নাকি ঠিক আমার মার মত দেখতে। তোমরা যখন কাল চলে গেলে তখন তোমার দিকে তাকিয়ে দাদু এই কথাই বলছিল।'

'তাই বুঝি!' হেসে বলল ললিতা।—'তাহলে তো তোমাকে আরও দুটো চকোলেট দিতে হয়! নইলে তো তোমার সঙ্গে ভাবটা জমিয়ে রাখা যাবে না!' বলে, ঝুমরুকে কোল থেকে নামিয়ে, হাতব্যাগটা খুলে, রঙিন প্যাকেটে মোড়া চারটে চকোলেট বের করে দিল। তারপর হেসে আবার বলল, 'আমার মনে হয়েছিল তুমি দাদুর সঙ্গে আজ এখানে আসবে। তাই এগুলি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম।'

'তুমি খুব ভাল',—বলে হেসে একটা চকোলেট মুখে পুরে দিল ঝুমরু। তারপর বলল—'বাঃ, কি সুন্দর মিষ্টি! তোমরা এসব পাও কোথায়?'

'আছে সে এক মজার দেশ!' দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল ললিতা।—'তুমি যাবে সেখানে?'

'যাব।'—ঘাড় নেড়ে বলল ঝুমরু। 'কিন্তু আমাকে কে নিয়ে যাবে? আমি যে ছোট। আমি যে কিছু চিনি না!'

'কেন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে।' হেসে বলল ললিতা।

'তোমার সঙ্গে!'—বড় বড় চোখ করে বলল ঝুমরু।

'হ্যাঁ'। বলল ললিতা।—'তোমার দাদুকে বললে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে দেবে না?'

'খুব দেবে।' চকোলেটটাকে চিবুতে চিবুতে বলল ঝুমরু। 'জান, দাদু তোমাকে খুব ভালবাসে। দাদু আমাকেও ভালবাসে।'

কথার মাঝে সর্দার বেরিয়ে এল তার লোকজন নিয়ে। সুকান্ত আগেই বেরিয়ে এসেছিল। এসে সে কি সব পরামর্শ করছিল মিঃ যোশীর সঙ্গে। সর্দারকে বেরিয়ে আসতে দেখে সুকান্ত কাছে এগিয়ে এল।

'সব তৈরী বাবু। দিন এবার বারুদ। ঢেলে আগুন দিয়ে আসি।' কেমন যেন মাতালের মত কথাগুলো বলল সর্দার।

সুকান্ত ভাল করে তাকাল সর্দারের মুখের দিকে। সেই সেদিনকার ভোরের মত তার চোখ দুটো আজ লাল। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। হয়ত সেদিনের মত কাল রাতেও সে নেশা করেছিল। হয়ত সারারাত ঘুময়নি। কিংবা হয়ত মুংলীর কথাই ভেবেছে সারাটা রাত।

'কোথায় বাবু, বারুদ দিন'—সর্দারের কথাতে যেন চমক ভাঙল সুকান্তর। সর্দার আজ এত ব্যস্ত যে তাকে এইটুকু ভাববার সময়ও সে দিতে চায় না।

'হ্যাঁ দিচ্ছি। এস', বলে সর্দারকে নিয়ে গেল সুকান্ত মিঃ যোশীর কাছে। যেতে যেতে বলল—'খুব সাবধানে বারুদ ঢালতে হবে, যেন বৃষ্টির জলে ভিজে না যায়।'

'সে তুমি কিছু ভেব না।' গম্ভীর হয়েই বলল সর্দার। 'সে সব আমি ঠিক করে দেব।'

এক সময়ে বারুদ নিয়ে চলে গেল সর্দার। এখন সে একা। কেননা লোকজনের আর দরকার নেই। আর এ কাজটাও খুব বিপজ্জনক। বারুদ ফেটে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটলে বাঁচবার আর আশা থাকবে না কারুর।

মিঃ যোশী এবার নিশ্চিন্ত হলেন। সুকান্তর দিকে চেয়ে বললেন—'যাক, কাজটা তাহলে নির্ঝঞ্ঝাটেই শেষ হতে চলেছে।' সুকান্তকে অভিনন্দন জানালেন তিনি। বললেন, 'আপনার জন্যেই বিনা গোলযোগে এ কাজটা শেষ হল। আমার তো সন্দেহ ছিল যে জোর করে এ কাজটা শেষ করাতে গিয়ে শেষে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার না সৃষ্টি হয়। সে সব

কিছুই হল না, আপনি চমৎকার ভাবে সব 'ম্যানেজ' করেছেন। আপনার সম্বন্ধে আমি হেড-অফিসে সব লিখব।'

হেসে জবাব দিল সুকান্ত—'আগে কাজটা শেষ হোক, তারপর ওসব দেখা যাবে।'

এরপর সুকান্তর সঙ্গে আরও কিছু কিছু কথাবার্তা হল মিঃ যোশীর। ওপারে খাদের নীচে বিজলী তৈরীর জন্য 'টারবাইনের' কিছু কিছু সরঞ্জামও এসে গেছে এর মধ্যে। সেগুলোকে বসাবার কাজ করতে হবে। তারপর এই জলকে দূরে নিয়ে যাবার জন্য 'ক্যানেল' তৈরীর কাজটাও বেশ বিরাট। মিঃ পাণ্ডে এবং আরও চার পাঁচ জন ইঞ্জিনিয়ারও এসে এ আলোচনায় যোগ দিল।

এক সময়ে সর্দার বেরিয়ে এল। বলল, 'সব তৈরী। এবার আপনারা সবাই দূরে সরে যান। এবার বারুদে আগুন দেব।'

সবার মধ্যেই যেন একটা উত্তেজনা দেখা দিল। অনেকদিন পরে আজ পাহাড় ফাটবে। একে একে সবাই সুড়ঙ্গর মুখ ছেড়ে খানিকটা দূরে সরে গেল। ঝুমরুও গেল ললিতার সঙ্গে। চকোলেট চারটে তার এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ললিতা আরও দুটো চকোলেট দিল তার হাতে।

দূরে গিয়ে সবাই অপেক্ষা করতে লাগল।

এবার শুধু সর্দার এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গটার দিকে। পেছন ফিরে সবাইকে সে দেখে নিল একবার। কি ভেবে পাহাড়ের ওপরটাতেও তাকাল একবার, যেখানে মুংলীকে শেষবারের মত দেখা গিয়েছিল। কি রকম যেন গম্ভীর দেখাতে লাগল সর্দারকে। থম্ থম্ করছে তার মুখটা। চোখ দুটো যেন

আরও লাল হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, কিসের যেন একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে সর্দারের মনে মনে।

বারুদ যেখানে ঢালা হয়েছে সেখান থেকে একটা লম্বা সরু দড়ি সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছে। ওটা 'ফিউজ'। ঐ 'ফিউজের' গায়ে গায়ে বারুদ লাগান। সেই 'ফিউজের' মুখেই আগুন লাগান হবে। ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলতে জ্বলতে সে আগুন এক সময় স্পর্শ করবে গর্তের মুখে ঠেসে দেওয়া বারুদকে। আর অমনি বিস্ফোরণ ঘটবে। ফেটে পড়বে পাহাড়।

'ফিউজের' মুখে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল সর্দার। তারপর মনে মনে গর্জ্জে উঠল সে। যাক—দেবতার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাক! মুংলীর জন্য তার বুকটাও তো ফেটে চৌচির হয়ে গেছে! কেন? কি অপরাধ করেছিল মুংলী যে দেবতা তাকে নিয়ে নিল? বুধন না হয় গেল, কেননা সে দেবতাকে মানত না। কিন্তু মুংলী?—না, দেবতা তাকে নিয়ে অন্যায় করেছে! ভীষণ অন্যায়! সে অন্যায়ের প্রতিশোধ সর্দার আজ ভালভাবেই নেবে। খুব ভালভাবেই সে বারুদ ঠেসেছে ঐ বড় বড় গর্ত দুটোর ভেতরে। চাই কি, এইতেই পাহাড়ের বুকটা ফুটো হয়ে যাবে। আর যদি না যায়, তবে আবার গর্ত করে আবার বারুদ ঠাসবে সে। পাহাড়ের বুকটা সে আজ ফুটো করেই ছাড়বে—নিষ্ঠুর দেবতা! হৃদয়হীন দেবতা! এতদিন বৃথাই সে এই দেবতার পূজো করে এসেছে। বৃথাই জানিয়েছে তার প্রার্থনা।

হঠাৎ যেন ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সর্দার। তারপর 'ফিউজে' আগুন লাগিয়ে চিৎকার করে উঠল—'সব হুঁসিয়ার।

সব দূর হটো। বারুদে আগুন লাগান হয়েছে।'—তারপর টলতে টলতে সে এগিয়ে এল সুকান্ত আর মিঃ যোশীর কাছে। সুকান্ত ওর হাত দুটো ধরে বলল—'তুমি যা করলে সর্দার, তার কথা আমরা কেউ ভুলব না।'

লাল দুটো চোখ তুলে সর্দার তাকাল সুকান্তর দিকে। তারপর একরকম গর্জন করেই বলল—'এ পাহাড়ের বুক আমি না ফাটিয়ে ছাড়ব না বাবুজি। আমি দেখে নেব, কার শক্তি বেশী। দেবতার না মানুষের ?'

লাল বিন্দুর মত 'ফিউজের' আগুনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল সুড়ঙ্গটার ভেতর। একটা চাপা উত্তেজনায় সবাই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আকাশটা এর মধ্যে আরও কালো হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, চারদিকের সব মেঘগুলো যেন ইচ্ছে করেই পাহাড়টার ওপরে এসে ভীড় করে জমা হয়েছে। গুর্‌গুর্‌ করে একবার মেঘ ডাকল। হয়তো এখুনি বৃষ্টি নামবে। হয়তো এখুনি ভাসিয়ে দেবে এদের সব প্রচেষ্টা। ব্যর্থ করে দেবে সর্দারের সব উদ্যম। দেবতা দেখিয়ে দেবে যে, মানুষের থেকে তার শক্তি শত সহস্র গুণ বেশী।

ঘড়ি দেখতে লাগল সুকান্ত। ঘড়ি দেখতে লাগলেন মিঃ যোশী। সবাই একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এত সময় তো লাগবার কথা নয়! এর মধ্যে তো বারুদে গিয়ে আগুন পৌঁছন উচিত ছিল! তবে কি 'ফিউজের' আগুন নিভে গেল ?

সুকান্ত তাকাল সর্দারের দিকে। বলল—'আমার মনে হয় ফিউজের আগুন বোধহয় নিভে গেছে সর্দার।'

'আমারও তাই মনে হয়।' বলল সর্দার। সুড়ঙ্গের ভেতরে সব জায়গাতেই তো জল পড়ছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সবাই। একটা স্থির কিছু না জেনে এখন সামনে এগনো বিপজ্জনক। হয়তো ফিউজে আগুন আছে। হয়তো সে আগুন এখনও বারুদের কাছে গিয়ে পৌঁছয়নি।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সর্দার বলল—'আমার মনে হয় আগুন সত্যিই নিভে গেছে বাবুজি। আমি বরং একবার দেখে আসছি।' বলে সর্দার উত্তরের অপেক্ষা না করেই হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গটার দিকে। সবাই ওকে সাবধান করে দিল।

দূর থেকে সবাই দেখল, সর্দার মাতালের মত টলতে টলতে সুড়ঙ্গটার ভেতরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু সুড়ঙ্গর ভেতরে ও কেন গেল? সুড়ঙ্গের মুখের কাছেই তো দাঁড়িয়ে দেখা যায় 'ফিউজের' আগুনটা কতখানি পর্যন্ত গেছে।

চিৎকার করে উঠল সুকান্ত, 'সর্দার, ভেতরে যেও না। বাইরে থেকে দেখেই চলে এস।'

কিন্তু সর্দার ফিরে তাকাল না। এক সময়ে তার দেহটা সুড়ঙ্গর বাঁকের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল আবার। আবার মেঘ ডেকে উঠল গুর্‌গুর্ করে। একটা দমকা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টাও লাগল ওদের গায়ে।

কয়েকটা মুহূর্ত। গুম্ গুম্ করে প্রতিধ্বনিত হল চারদিক। একরাশ ধোঁয়া বেরুল পাহাড়টার ওদিকটা দিয়ে।

চিৎকার করে উঠল সর্দারের লোকেরা। পাহাড় ফুটো হয়ে গেছে বাবুজি। ঐ দেখ, সুড়ঙ্গের ওদিক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সবাই ঝুঁকে দেখল, সত্যিই! সুড়ঙ্গের ভেতর

দিয়ে ওপারের আকাশের এক চিল্‌তে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সর্দার! সে যে ভেতরে! ব্যগ্র হয়ে উঠল সবাই।

ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল কয়েকজন সুড়ঙ্গটার মধ্যে। একটু পরে সর্দারকে ধরে ধরে বের করে নিয়ে এল তারা। সর্দারের কপালের এক দিকটা ভীষণ ভাবে ফেটে গেছে। চোখ দুটো রক্তে ভরে গেছে তার।

দাঁড়াতে পারল না সর্দার। বসে পড়ল মাটিতে। ব্যস্ত হয়ে সকলেই এগিয়ে গেল সর্দারের কাছে।

উৎকণ্ঠিত হয়ে সুকান্ত ঝুঁকে পড়ল সর্দারের মুখের কাছে। 'একি করলে সর্দার! কেন তুমি এসময়ে ভেতরে গেলে?'

ধুতির খুঁটটা দিয়ে চোখের রক্তটা একটু মুছে নিল সর্দার। তারপর হেসে বলল—'দেখলাম পাহাড়ের বুকটা কি ভাবে ফাটে।'

'কিন্তু তুমি যে ভীষণ ভাবে আহত হয়েছ।'

'ও কিছু নয়। একটা বড় পাথর খালি কপালটার ওপর ছিট্‌কে এসে লাগল। ও দু'একদিনের মধ্যেই সেরে যাবে।' বলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে আবার চোখদুটো মুছল সর্দার। তারপর একটু থেমে বলল—'পাহাড়টা কি ফুটো হয়ে গেছে বাবুজি? আমার মনে হল আমি যেন ওদিকের আকাশটা দেখতে পেলাম! হঠাৎ যেন সুড়ঙ্গটা আলোয় ভরে গেল।'

'হ্যাঁ সর্দার, পাহাড় ফুটো হয়ে গেছে। এখান থেকেই আমরা ওপারের আকাশ দেখতে পাচ্ছি। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।' বলে পকেট থেকে রুমাল বের করে সুকান্ত সর্দারের চোখ দুটো ভাল করে মুছিয়ে দিল। তারপর ফিরে তাকাল মিঃ যোশীর দিকে। ইসারায় মিঃ যোশীকে এক্ষুনি ডাক্তারকে

খবর দেবার কথা বলল। মিঃ যোশী একজনকে পাঠিয়ে দিলেন ডাক্তারকে ডেকে আনবার জন্য।

সুকান্তর হাতটা চোখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল সর্দার। তারপর হেসে বলল—'আমার কিছু চোট লাগেনি বাবুজি। আমি আজ ভয়ানক খুশী, মুংলীকে নিয়ে ঐ পাহাড় আমার বুক ফাটিয়েছে। আজ আমি ওর বুক ফাটিয়ে দিলাম।' বলে পাহাড়টার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল সর্দার। কিন্তু সে হাসির মধ্যে কোনও আনন্দের সাড়া পাওয়া গেল না। মনে হল, সে হাসির মধ্যে যেন রয়েছে বেদনাময় একটা ক্রন্দন।

সবাই চুপচাপ। হাসি থামিয়ে সর্দার হাঁপাতে লাগল। হাসির দমকে কপালটা দিয়ে আরও কিছুটা রক্ত গড়িয়ে পড়ে চোখ দুটোকে আবার ভিজিয়ে দিল। রক্ত পড়তে দেখে মিঃ যোশী ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পাশের একটি লোকের কাছ থেকে ধুতির একফালি ছিঁড়ে নিয়ে তিনি সর্দারের কপালটা বেঁধে দিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সর্দার। তারপর তাকাল এদিক ওদিক। ব্যগ্র কণ্ঠে বলল—'আমার ঝুমরু কোথায়?' বলে ঝাপসা চোখে সে হাত দুটো বাড়িয়ে ঝুমরুকে খুঁজতে লাগল।

ঝুমরু এতক্ষণ ভয় পেয়ে ললিতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল্। দাদুর কপাল, মুখে এত রক্ত সে দেখেনি। সুকান্ত ঝুমরুকে ললিতার কাছ থেকে নিয়ে এসে সর্দারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'এই তো তোমার ঝুমরু, সর্দার।'

অধীর আবেগে সর্দার ঝুমরুকে নিজের কাছে টেনে নিল।

তারপর তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—'আমার মুংলীর একমাত্র চিহ্ন! ও যেন বেঁচে থাকে বাবুজি। ওর যেন কিছু না হয়।'



'ওর জন্যে তুমি ভেব না সর্দার।' সান্ত্বনা দিয়ে বলল সুকান্ত। 'তুমি আগে ভাল হয়ে ওঠ, তারপর সব ঠিক

হয়ে যাবে। ডাক্তার আনতে লোক গেছে। এখুনি এসে পড়বে।' বলে ঝুমরুকে সর্দারের কাছ থেকে সরিয়ে আনল সুকান্ত।

'ডাক্তার আমাকে ভাল করতে পারবে না বাবু।' বলে হঠাৎ মাথাটা চেপে ধরল সর্দার। তারপর যন্ত্রণায় মুখটা একটু বিকৃত করল। তারপর একটু থেমে বলল—'আমার চোট খুব জোরে লেগেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি আর বাঁচব না।'

'না না, সর্দার, তুমি বাঁচবে। তুমি দেখবে সেই সুদিন, যার জন্যে আজ আমরা এত মেহনত করছি।'

একটু থেমে হঠাৎ প্রশ্ন করল সর্দার—'আচ্ছা বাবুজি, এই বাঁধের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাদের আর কোনও কষ্ট থাকবে না, না ?'

'হ্যাঁ সর্দার।'

'আমার ঝুমরুও তাহলে একদিন বড় হবে! লেখাপড়া শিখবে!' ঘোলাটে দুটো চোখ তুলে কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বলল কথাগুলো সর্দার। মনে হল, কোথায় যেন ওর ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

'নিশ্চয়ই লেখাপড়া শিখবে সর্দার।' বলে সুকান্ত একটা পাথরের টুকরো টেনে এনে সর্দারের সামনে এসে বসল।

কিন্তু ঝুমরু যে একেবারে একা। তাকে যে দেখবার কেউ থাকবে না বাবুজি ?' আবার জড়িয়ে জড়িয়ে কথাগুলো বলল সর্দার।

'কেন, তুমি যাবে কোথায় ?'—প্রশ্ন করল সুকান্ত।

'আমি আর থাকতে পারব না বাবুজি। দেবতা আমাকে নিয়ে নিল। এবার আমাকে যেতে হবে।' বলে

বাঁ হাতটা দিয়ে কপালটার একধার চেপে ধরল। তারপর মাটিতে এলিয়ে পড়ল।

ঝুঁকে পড়ল সুকান্ত সর্দারের মুখের ওপর।—'না না সর্দার, তুমি বাঁচবে। তুমি ভাল হয়ে যাবে। তুমি অমন মুষড়ে পড়ো না। ডাক্তার এখুনি এসে যাবেন।'

কোনও জবাব দিল না সর্দার। চুপচাপ মাটির ওপরে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল সুকান্তর দিকে। তারপর আরও টেনে টেনে, আরও জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—'একটা কথা বলব বাবুজি?'

'কি?'

'আমার ঝুমরুকে যদি তোমার হাতে তুলে দিই! তুমি কি তাকে দেখবে?'

'ওসব কথা ভেবে কেন তুমি ব্যস্ত হচ্ছ সর্দার?'

'ভাববার সময় এসেছে বলেই ভাবছি বাবুজি। বল বাবুজি, তুমি দেখবে?' বলে সুকান্তর একটা হাত চেপে ধরল সর্দার।

'কেন দেখব না সর্দার? ললিতা তো ওকে খুব ভালবাসে।'

একটা পরম তৃপ্তিতে সর্দারের মুখে একটা হাসি খেলে গেল। তারপর চোখ বুঁজেই বলল—'আমার ঝুমরুও ওকে খুব ভালবাসে। সকাল থেকেই দেখেছি, ঝুমরু সারাক্ষণ ওর পাশে পাশে ঘুরে বেরিয়েছে।'

একটু থামল সর্দার। গভীর ভাবে একটা নিঃশ্বাস নিল, তারপর আবার চোখ মেলে চাইল। মনে হল, ওর চোখ দুটো যেন ভয়ঙ্কর রকম ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। একটা ঘরঘরে আওয়াজ বেরুল সর্দারের গলা দিয়ে। অতি কষ্টে সে বলল—'তোমাদের সঙ্গে ওকে সহরে নিয়ে যাবে বাবু?'

'নিয়ে যাব সর্দার'। সর্দারের কানের কাছে মুখটা এনে বলল সুকান্ত।

'ওকে লেখাপড়া শেখাবে ?'

'শেখাব।'

'মুংলীর আশা তা হলে একদিন পূরণ হবে ?' বলে একটু হাসল সর্দার। তারপর আরও কি যেন বিড় বিড় করে বলল, কিন্তু সেগুলোর এক বর্ণও কেউ বুঝতে পারল না।

মিঃ যোশী তাকালেন সুকান্তর দিকে। সুকান্তও উঠে দাঁড়াল। ওরা বুঝল, সবই বোধহয় শেষ হয়ে এল। তবুও মিঃ যোশী ডাক্তারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মিঃ পাণ্ডে তার জীপটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল সর্দারের। ললিতা এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এবার সে এগিয়ে এল। এসে বসল সর্দারের মাথার কাছে। তারপর শাড়ীর আঁচলটা দিয়ে অতি স্নেহভরে সর্দারের রক্তভরা চোখ দুটো মুছিয়ে দিল।

এতক্ষণ বেহুঁসের মতই পড়েছিল সর্দার। হঠাৎ যেন জ্ঞান ফিরে এল তার। চোখ মেলে তাকাল সে ললিতার দিকে। তারপর আবেগভরে ললিতার একটা হাত চেপে ধরল। তারপরে অকুণ্ঠ স্বরে ডাকল—'মা'।

ছোট্ট এই 'মা' ডাকে ললিতার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। কি মিষ্টি এই ডাকটা! এই ডাকটা শোনবার জন্য কতদিনই না তার অন্তরটা তৃষিত হয়েছিল।—হাসপাতালে যখন ছেলেটা জন্মাল তখন একটা কান্নার শব্দ এসেছিল ললিতার কানে। কিন্তু 'মা' ডাকবার আগেই সে চলে গেল!—একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে ললিতা ঝুঁকে পড়ল সর্দারের মুখের দিকে।

সর্দার তখনও দুটো করুণ চোখ মেলে ললিতার দিকে তাকিয়ে আছে।

'বল, কি বলবে সর্দার ?'—আবেগভরে বলল ললিতা।

'আমার ঝুমরুকে তুমি নেবে মা ?'—কেঁপে কেঁপে বলল সর্দার।

'নেব।'

'বেশ। আমার ঝুমরুকে আমি তোমায় দিয়ে দিলাম। মুংলী নেই। তুমি ওকে দেখো।'—বলে সর্দার চোখ দুটো বুঁজল।—সর্দার যে হাতটা দিয়ে ললিতার হাতটা চেপে ধরেছিল, সে হাতটা একটু একটু করে শিথিল হয়ে এল।

ললিতা চেয়ে রইল সর্দারের মুখের দিকে। তারপর সর্দারের কানের কাছে মুখ এনে বলল—'তুমি ঝুমরুর জন্যে কোনও চিন্তা কোরো না সর্দার। ওর সব ভার আমি নিলাম।'

একটু পরে আবার চোখ মেলে তাকাল সর্দার। মনে হল, চোখ দুটো খুলতে যেন তার ভীষণ কণ্ঠ হচ্ছে। একটা ম্লান হাসি হাসল সে ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বলল—'আজ আমার বড় আনন্দের দিন,—বড়—' কথাটা আর শেষ করতে পারল না সর্দার। মাথাটা তার একদিকে হেলে পড়ল।

সবাই চুপচাপ। কারুর মুখে কোনও কথা নেই।

সর্দারের শিথিল হাতখানা নিজের হাত থেকে ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ললিতা। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটো সে-মুছে নিল একটু। তারপর এগিয়ে ঝুমরুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ঝুমরু অবাক হয়ে দেখছিল এইসব। তার ছোট্ট মন বুঝতে পারছিল, তার দাদুর ভীষণ কি যেন একটা কিছু

হয়েছে। দাদুর মাথাটা অমন কাত হয়ে পড়ে যাওয়াতে সে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল। ললিতা ঝুমরুকে কোলে তুলে নিয়ে তার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরল।

ঝুমরুকে দেখে সুকান্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার মনে পড়ে গেল ডাঃ সেনের কথাগুলো। ডাঃ সেন বলেছিলেন—'ললিতাকে বাঁচাবার জন্য আমরা 'অপারেশন' করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু এতে ভবিষ্যতে ললিতার সন্তান হবার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল।'—ললিতা এ কথাটা এখনও জানে না। যখন জানবে তখন হয়ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। তখন হয়ত ঐ ঝুমরুই থাকবে তার কান্নায় সান্ত্বনা দেবার জন্য।

মিঃ পাণ্ডে ডাক্তারকে নিয়ে এসে গেলেন। ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার জীপ থেকে নেমে এগিয়ে এলেন সর্দারের দিকে। পরীক্ষা করে দেখলেন তাকে। তারপর মিঃ যোশীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'সব শেষ।'

স্তব্ধ হয়ে কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সবাই। তাদের সর্দার চলে গেল। কিন্তু যাবার আগে শেষ করে দিয়ে গেল সে কাজটা, যেটা সে একদিন সুরু করেছিল।

আকাশে ধীরে ধীরে আরও যে মেঘ কখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল সে খেয়াল কেউ করেনি। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে। কড়্ কড়্ করে কোথায় যেন বাজ পড়ল দূরে। নেমে এল বৃষ্টিধারা, তীরের ফলার মত সে জলবিন্দু এসে ফুটতে লাগল ওদের দেহে।

সর্দারের দেহটা পড়েছিল পাহাড়ের গায়ে। নিস্পন্দ, নিঃসাড়। বৃষ্টি পড়তে লাগল সর্দারের গায়ে, মাথায়, মুখে।

সবাই তাকাল আকাশের দিকে। ভাবল, সর্দার আজ যে আত্মত্যাগ করে গেল, তাতে হয়তো দেবতা খুশীই হয়েছেন। তাই বুঝি তিনি স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর আশীর্বাদ-স্বরূপ এই বৃষ্টিধারা। পাঠিয়ে দিলেন সর্দারের এই তপ্ত দেহটাকে শান্ত, শীতল করে দিতে!